পিতৃদেবের শ্রীচরণে

নরেশ্বর

পাষাণপুরী

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

দেড়টাকা

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাষাণপুরী

১

কলিকাতা সহরে তখন শীতের মরশুম। বড়দিনের আনন্দে সহর গরম। বাজারে দোকানে উপহার খরিদ করিতে সাহেব সুবা হইতে বাঙ্গালী ভাটিয়া মাড়োয়ারী পাঞ্জাবী মায় কাবুলিওয়ালা পর্য্যন্ত ভিড় জমাইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে অনেকেই ভাগ্যটিকে হাতে লইয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। মোটের উপর যেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় এমনি তাড়াহুড়া, এমনি ডিগ্‌বাজী। দেখিতে দেখিতে বড়দিন শেষ—সঙ্গে সঙ্গে সহরের হৃদ্‌পিণ্ড দৈনন্দিন কাজের রূঢ় চাপে পিষ্ট হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। উৎসবান্তে শরীরের রক্তস্রোত দ্রুত চলাতেই হউক, আর মানুষের নিবৃত্তিমার্গটা স্বভাবের একটা অপরিহার্য্য দিক, অথবা আকর্ষণ তার আপন উত্তেজনার আঘাতে নিস্তেজ হয় অথবা যে কোন দৈব বা প্রাকৃতিক কারণেই হউক বড়দিনের পর জনমানব একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শীতকালে কলিকাতায় সন্ধ্যা বেলাটা যেমন প্রতি বৎসরেই ধূম্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয় সেদিনও ইহার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। প্রাসাদ, অট্টালিকাশ্রেণীদ্বারা সীমাবদ্ধ আকাশের কুয়াসা নীচের দিকে আসিবাব সময় কয়লার ধুঁয়ার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়—শক্তি-পরীক্ষায় কেউ হার

মানিতে চায় না, কারণ একদল স্বর্গবাসী অন্য দল পাতালের অনুচর ; কিন্তু এই কৃষ্ণবর্ণ দানব আর ধূসরাকৃতি দেবতার লড়াইয়ে যে মানুষের নাক কান চোখ বন্ধ হইয়া যায় এ কথাটা তাদের কেহ বুঝেনা।

এমনি অবস্থায় সেদিনও পটলডাঙ্গার একটি মেসের গলিতে সন্ধ্যা নামিয়াছিল। কুয়াসার প্রহেলিকা-ম্লান গ্যাসপোষ্টের নীচে দাঁড়াইয়া তিনটী যুবক এতক্ষণ গল্প করিতেছিল। তাহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা, হাসি কাশি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু সেদিকে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। তাহাদের তর্কের প্রধান কারণ, সেদিন শনিবার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায় তথাপি তাহারা বায়স্কোপে গেল না। তিনজনের একমত হইলে যে কর্ম্মগুলিও সমবাদী হইত তাহা বোধ হয় পাঠকদের বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। অজিত, দেবব্রত, নির্ম্মল প্রভৃতি নামের মধ্যে যেমন বৈষম্য আছে তেমনি তাহাদের চরিত্র, উপাধি ও কাজের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। অজিত চট্টোপাধ্যায় এম, এ ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত ঘোষাল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আর নির্ম্মল রায় বি, এ অথচ কবিযশোপ্রার্থী। সাধারণতঃ কলিকাতার বড়-লোকের ছেলে হইলে যেরূপ ভাগ্যবান হয় অজিতের সেই পয ছিল। দেবব্রতের কপালটা তত গজমার্কা না হইলেও তাহার পিতা স্থানীয় একটা কলেজের প্রফেসার—মধ্যবিত্ত চালচলনে থাকিলেও তাহাদের নিজেদের বাসোপযোগী ভদ্রাসন বাড়ী ছিল। নির্ম্মল রায়ের পিতা এককালে লোহার বাজারে যথেষ্ট পয়সা করিয়াছিলেন ; কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যবসাপত্তর বিষয় আশয় এমন কি কলিকাতার পাঁচতলা ইমারতখানা পর্য্যন্ত নীলামে উঠিয়া গিয়াছিল। অবস্থা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ যত বাড়িয়াছিল, অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের সময় সম্পদ বিদায় লইল। আর বেহুদা চালচলন,

অভ্যাস, স্বভাবের খেয়াল প্রভৃতি আপদগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া তাহাদের ঘাড়ে চাপিল। নির্ম্মলের পিতা তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সামান্য বেতনে একটা কেরাণীর কাজ লইয়া স্বগ্রাম বারাসত হইতে যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। হৃতসর্ব্বস্ব, হতশ্রী বৃদ্ধকে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার চরণাশ্রয়ে টানিয়া লইলেন। তার পর হইতেই নির্ম্মল টিউশানি করিয়া মেসের খরচ বহন করে, তদুপরি যৎসামান্য বৃদ্ধা মাতার কাছে পাঠায়, মোটের উপর সে দরিদ্র।

অজিত, দেবব্রত ও নির্ম্মল তিন জনেই বিভিন্ন অবস্থার পর্য্যাযে হইলেও তাহারা একে অপরকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। বাল্যকাল হইতে এণ্ট্রান্স শ্রেণী পর্য্যন্ত তিন জনেই মেধাবী সতীর্থ ছিল। ক্লাসে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব লইয়াও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির হওযাতে প্রতি বিষয়েই তাহাদের মধ্যে তর্কযুক্তির দ্বন্দ্ব, ভাবের ঝগড়া হইত। সে দিনও সেই ঝাপ্সা আলোর নীচে দাঁড়াইয়া তাহারা একটা অতি সাধারণ বিষয় লইয়া বিতণ্ডা পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

অজিত ও দেবব্রত পথে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, নির্ম্মলকে লইয়া গ্লোব কি ম্যাডানে কি এলফিনষ্টোনে ছবি দেখিযা সন্ধ্যাবেলাটা কাটাইয়া আসিবে। কিন্তু মেসে আসিয়া শুনিল নির্ম্মল সেই তিনটায় বাহিরে গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। তাহারা দুইজনে পাঁচটা হইতে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সমস্তগুলি মিনিটের দিকে চোখ রাখিয়া অবশেষে মনে মনে ওকে অনেক মুখরোচক বিশেষণে মণ্ডিত করিয়া নীচে নামিতেছিল। হঠাৎ নির্ম্মল তাহাদের সুমুখে দাঁড়াইতেই তাহারা দুইজনে তাহাকে চোরের মত ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নির্ম্মল বাধা দিয়া বলিল, আমি বায়স্কোপে যাব না, তোমরা এসগে।

অজিত তাহার কথাটা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। সে পুনরায় নির্ম্মলকে জোর করিতেই দ্বিতীয় জন উত্তর দিল, কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার মাথাটাতো আর কিনে রাখনি অজিত; তোমাদের মত এমন হু হু করে বেড়ানো আমার চলে না। রাগ কোরোনা দেবু, আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু আমাদেরও একটা আত্মসম্মান আছে; তোমরা পয়সা খরচ করে আমাকে বায়স্কোপ দেখাবে এ প্রথা কি চিরকালই চলতে পারে?

দেবব্রত নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া দেখিল সেখানে যেন একটা করুণ কান্না ঢেউ খেলিয়া উঠিতে চায়। সে তাড়াতাড়ি অজিতের হাতটা টানিয়া নির্ম্মলের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, কিছু যে বুঝতে পারছিনে নিমু? তোমাকে পয়সা খরচ করে আমোদ প্রমোদে নিয়ে যাই বলে কি মুখ ফুটে কখনো বলেছি?

নির্ম্মল চক্ষুর ছল ছল ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিল, তুমি না বলতে পারো, কিন্তু যে বলেছে সে যদি অন্ততঃ আমাকে দু'কথা বলত আমি একটুও মনে নিতাম না। কিন্তু মীনাদের বাড়ী বসে, মীনা, মাসিমা মেসোবাবুর সুমুখে এসব কথা বলে বাহাদুরী নিতে গিয়ে সর্ব্বসমক্ষে আমাকে লোফার বানিয়ে দেওয়া কি অজিতের উচিত হয়েছে? তুমি যে আমাকে অকৃত্রিম ভালবাসো, তুমিই যে আমাকে মীনার মাষ্টারীতে টেনে নিয়ে গেছ, এ কথা কি আবার জাহির করতে হবে? আমি ওসবের কোন মানে বুঝতে পারছি নে। তোমার সঙ্গে মীনার ভাব থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্যে তুমি আমাকে তোমার শত্রু ভাবতে পারো না অজিত! আমি আজ বলে এসেছি, ওর জন্যে অন্য লোক দেখুন, আমি দয়ার টিউশনি করতে আসব না।

অজিত ও দেবব্রত এতকাল নির্ম্মলের কথা শুনিতেছিল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া। কিন্তু অজিত ফস্ করিয়া নির্ম্মলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আমাকে তো জান, নিমু, আমি কোন উদ্দেশ্য বুকে নিয়ে কোন কথা বলিনি। ওতে যদি তুমি আঘাত পেয়ে থাকো তবে আমায় ক্ষমা কোরো।

নির্ম্মল কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু দেবব্রত তাহার পূর্ব্বেই বলিল, দেখ আমি কাঠখোট্টা মানুষ, লোহা পিটে বেড়াই, তোমাদের এসব ঝগড়াঝাঁটির কোনই মূল্য বুঝিনে। নিমু এখন যাবে কিনা চল, আর তো সময়ও নেই। তুমি যদি এখন না যাও তো বল, আমরাই খানিকটা ভ্যাগাবণ্ডের মত ঘুরে আসিগে।

নির্ম্মল স্পষ্ট অথচ সহানুভূতির স্বরে বলিল, তুমি কিছু মনে কোরোনা অজিত! আজ আমায় মাপ কোরো। কাল রবিবার আছে বরং কাল বিকেলেই যাওয়া যাবে।

অজিত প্রতিবাদ করিয়া কহিল, বাঃ কাল যে সন্ধ্যাবেলা মীনাব বাড়ী নেমন্তন্ন, তুমি যাবেনা?

দেবব্রত আশ্চর্য্যকণ্ঠে কহিল, সেকি! তুমি না গেলে যে আমাদের আসরই জমবে না। মেয়েদের সঙ্গে বলবার মত কোন কথাই তো আমাদের নেই—বরঞ্চ তোমার এই কবিতা গল্প নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে। সেটি হচ্ছেনা, তুমি না গেলে আমরাও যাব না।

অজিত নির্ম্মলের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বলিল, বল যাবে! তা'হলে আজ তোমাকে ছুটি দিচ্ছি।

কথাটা শেষ করার পূর্ব্বেই সে নির্ম্মলকে জড়াইয়া ধরিল। নির্ম্মল হাসিয়া বলিল, এত যদি আমাকে না নিয়ে গেলে কোথাও চলেনা, তবে আবার আমার বিরুদ্ধে যেতে চাও কোন সাহসে?

আর বলবনা,—যদিও একটু আধটু বেফাঁস কিছু বলিতো সামলে নিতে পারবে না ? জীবনটাকে এত সিরিয়াস্ করে দেখিনি—সংসারকে এত জড়াতে চাইনে নির্ম্মল !

অজিতের অসমাপ্ত কথার স্রোত চাপা দিয়া নির্ম্মল বলিল, এক আধটু বাস্তব জগতের মন নিয়ে কারবার করতে শেখ, যাকগে আজ আর তোমাদের দেরী করাব না, কাল কি আমাকে নিয়ে যাবে ?

নিশ্চয়ই আসব, বলিয়া দুই বন্ধু নির্ম্মলকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

যদিও তাহারা ধর্ম্মতলার বাস ধরিবার জন্যে ট্রেণের ডেলি প্যাসেঞ্জারের মত রুদ্ধনিশ্বাসে আসিতেছিল তথাপি ক্ষণপূর্ব্বের ঘটনার তিক্ত ঝাঁঝটা যেন দুই জনের রসনাতেই বাক্যের অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছিল। নির্ম্মলের সকরুণ অপ্রিয় সত্যভরা কথাগুলি যদিও তাহারা সরলতার তরঙ্গে সরাইয়া ফেলিয়াছিল তথাপি থাকিয়া থাকিয়া ইহারই একটানা রেশটা যেন তাহাদের দুইজনকেই এমন এক অতি অপরিচিত স্থানে ফেলিয়া দিল, যে কেমন করিয়া তাহাদের পরিচয়-প্রসঙ্গ সুরু হইবে ইহাই তাহাদের পক্ষে কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এমনি নীরব, চিন্তিত, গম্ভীর অধোবদনে যন্ত্রচালিতের মত দুইজনে যখন কলেজ-স্কোয়ারে আসিয়া ধর্ম্মতলার গাড়ীতে বসিল তখন দেবব্রত যেন এই অসহ্য কণ্টকিত নীরবতার লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে আরম্ভ করিল, অজিত, আজ আর মাঠে গিয়ে কাজ নেই, চল একবার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সভাটাতে যোগ দিয়ে আসি, ওরা নেমন্তন্ন করেছে—হাজার হোক আমিও তো একটা মেম্বর !

অজিত তখন টিকিট লইয়া গলার মাফলারটা ভাল করিয়া আঁটিতেছিল। সে একবার উঠিয়া পুনরায় স্প্রিংয়ের গদিতে লাফাইয়া

বসিল। দেবব্রতের কথার উত্তর দিতে মুহূর্ত্তেক বিলম্ব ঘটিল। পরে বলিল, দেখ, এই সঙ্গে বেলাটা যদি নষ্ট করতে না চাও তো চুপ মেরে বসে থাক, পরে নিউমার্কেট্‌টা ঘুরে এলে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে,—

অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই সে প্রস্থানোদ্যত দেবব্রতকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, দেখ দেবু, তোদের আর মানুষ করতে পারলামনা। কোথায় ফূর্ত্তি করবে, স্রোতের ফুলের মত শাদা ফেনার সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে চলবে, মুহূর্ত্তের অমূল্য সুযোগগুলি সার্থকতায় ভরে নেবে, তা নয় কেবল ভারী ভারী কথা, প্রতিষ্ঠান আন্দোলন-সংগঠন সংস্কার মাথা মুণ্ডু ছাই আরো কত কি? এসবের কি দরকার মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে, এই প্রতিষ্ঠানের কি প্রয়োজন বলতে পারো?

দেবব্রত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাসটা এস্প্ল্যানেডের মোড়ে আসিয়া থামিয়াছিল। সে উঠিয়া অজিতকে একটা খোঁচার নামিবার ইঙ্গিত দিয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। অজিত পা-দানিতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

এসনা, বলিয়া দেবব্রত অজিতকে টানিয়া সোজা তাহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দিকে চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে নির্ব্বাকভাবে হাঁটিয়া প্রতিষ্ঠানের দোর-গোড়ায় পৌছিলে পরে দেবব্রত কহিল, শুধু ভাব দিয়ে যে কাজ হয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে তার সহস্রগুণ বেশী ফল পাওয়া যায়। মাষ্টার যখন বোর্ডের গায়ে খড়ির দাগ কেটে জ্যামিতি বুঝান তখন ছেলেরা যেমন বোঝে শুধু বই পড়লে ততটুকু বুঝতে পারে না। কোন একটা নতুন প্রেরণা, অভিনব জ্ঞান, সত্য ধারণা যখনই জনসমাজে প্রচার করতে যাবে তখনই প্রতিষ্ঠান খাড়া

করতে হবে। না হলে ইউনিভার্সিটিরও কোন প্রয়োজন থাকত না। এখন চল, খানিকক্ষণ বসে আসবে।

দেবব্রত অজিতকে পাইবার জন্য হাত বাড়াইল কিন্তু অজিত কয়েক হাত দূরে পিছাইয়া গিয়া বলিল, কি করব দেবু, সত্যি সত্যি আমার এসব ভাল লাগেনা, তুমি এস। আমি একটু পরে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

দেবব্রত মনে মনে বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, কোথা যাবে ?

নিউ মার্কেট, বলিয়া অজিত তীরের মত অগ্রসর হইল।

চুলোয় যাকগে, বলিয়া দেবব্রত আপন মনে আরও কত কি বিড় বিড় করিয়া প্রতিষ্ঠানের সভাগৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার মনে কেবলি একটা কথা জ্বালার মত ক্ষীণ সহানুভূতির সুরে বাজিতে লাগিল যে, এত হালকা ভাবে, এত নির্ভাবনায়, এক টুকরা রৌদ্রকণার মত, আকাশের গাঢ় নীলাঞ্চলে আনন্দচঞ্চল প্রধাবিত বলাকার ন্যায় অজিতের জীবনটি আপন গতির ছন্দে নির্ম্মল তরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু ইহাতে কি জীবনের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহামহিম মানবত্বে পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করিতে পারিবে !

২

পরদিন অপরাহ্নের দিকে তিন বন্ধুতে পুনরায় মিলিত হইল। পানাপুকুরে ঢিল পড়িলে যেমন ইহার আঘাতটা কিছুক্ষণের জন্য জলের উপর দাগ কাটিয়া পুনরায় বিলীন হয় তেমনি তাহাদের গত সন্ধ্যার অপ্রিয় ঘটনাগুলির কোন অস্তিত্ব সে দিন আর ছিল না। তিনটি বন্ধু, তিন জন বিশুদ্ধচিত্ত সুন্দর সুদর্শন যুবাপুরুষ, সৌহার্দ্যের নিগড়ে বন্দী, প্রভাতের অরুণাভা যাহাদের জীবনে ছন্দময় পদক্ষেপে মহান ভবিষ্যতের সূচনা করে, তাহারা তিন বন্ধু নিশীথের ঝড়ের আবর্ত্তন বিস্মৃত হইয়া পুষ্পশীর্ষ তরুর ন্যায় নবীন উদ্বোধনে জাগ্রত। তিনজনে সেদিন আর বাসে কিম্বা ট্রামে গেল না। কারণ, অজিতের বাড়ীর জুড়ীখানা তাহাদিগকে মীনাদের বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গেল।

মীনাদের বাড়ী এলগিন রোডের উপরে একটা বিশাল বাগানের শীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ গর্ব্বোন্নত বেশে পথিকমাত্রেরই চক্ষু সহজেই টানিয়া লয়। সিংহদ্বার পশ্চাতে ফেলিয়া নানা দেশী বিলাতী ফুলে গুল্মে সুশোভিত কেন্দ্রকাননের পাশ দিয়া গাড়ীখানা তাহাদিগকে একেবারে গাড়ী-বারান্দার তলাটাতে নামাইয়া ফিরিয়া গেল। সিঁড়ি বাহিয়া তিন জনেই দোতলার হল ঘরটির দিকে চলিয়া গেল—কোন বয় বাবুর্চি তাহাদিগকে বাধা দিল না; কেন না তাহারা তিনজনেই এই বাড়ীর খুকীমণি, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা মীনার ক্রীড়া-সহচর বলিয়া সম্ভ্রান্ত। বৈঠকখানার দুই পার্শ্বে নানা রঙে বিচিত্রিত ঝালরকাটা পর্দ্দার অন্তরালে দুইটী কক্ষ। একটীতে মীনা তাহার সেলাই, চিত্রাঙ্কণ সূক্ষ্ম শিল্পদ্রব্য, ডিজাইন ও

অপরাপর কারুকার্য্যের প্রদর্শনী বানাইয়াছে, আর দ্বিতীয়টি তাহার পাঠাগার। বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্ব এবং মীনার পুরুষ ও স্ত্রী-বন্ধুবান্ধব আসিলে মীনা সর্ব্বপ্রথমেই তাহার প্রদর্শনীটিতে টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু তাহারা এই দুটি ঘরের কোনটাতেই গেল না। এই সময়ে মীনা যে তার মায়ের কাছে বসিয়া চপ কাট্‌লেট্ তৈয়ারী দেখিতেছে ইহা অবধারিত। তাই তাহারা হল-সংলগ্ন চওড়া বারান্দা ঘুরিয়া একেবারে মীনার পিতা উমেশবাবুর আরামগৃহে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। উমেশবাবুর পূরা নাম বলিতে হইলে অবশ্য মুখোপাধ্যায় উপাধিটি যোজনা করিতে হয়। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের উর্দ্ধে। বিহার অঞ্চলে কোন একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সম্প্রতি কাজ ছাড়িয়া কলিকাতায় স্থায়ী আসন লইয়াছেন। মাথার চুল, মুখের দাড়ী গোঁফ সমস্তই কাশফুলের মতন সাদা। শণের মত দাড়ির পুচ্ছদেশে একটী ঝুটী বাঁধা—বোধ হয় তাঁহার আদরিণী মেয়ের সূক্ষ্ম রুচি এখানেও আত্মপ্রকাশের লিপ্সা সম্বরণ করিতে পারে নাই। উমেশবাবু শশব্যস্তে আসন ছাড়িয়া তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া পরম ব্যগ্রভাবে বসিবার কথা বলিলেন। তাহারা আসন গ্রহণ করিলে পরে তিনি তাহাদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, মিনু, মিনি—ও মীনু, এদিকে আয় না—দেখ এসে অজিত এসেছে, ওর বন্ধু, তোর মাষ্টার বাবু।

তাঁহার কথার মাঝখানেই মীনা আসিল। তাহাদের সকলকে চতুর চক্ষে দেখিয়া অজিতের পানে সরল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, কতক্ষণ হয় তো এসেছ—কেন মার কাছে গেলে কি অপরাধ হত ?

অজিত প্রতিধ্বনিস্বরূপ উত্তর দিল, কেন বাবার কাছে আসাতে কি কোন অন্যায় হয়েছে ?

ইতিমধ্যে মীনা উমেশবাবুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের শুভ্রকেশের মধ্যে আঙ্গুল চালনা সুরু করিয়াছে। অকস্মাৎ অজিতের এই আক্রমণটাতে সে একটা অভিমানী কটাক্ষপাত করিয়া, পিতার কণ্ঠদেশে মৃণালের মত কোমল দুটী বাহুলতা বেষ্টন করিয়া কিয়ৎক্ষণ অজিতের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে সে দৃষ্টি বাহিরের বহুদূর আকাশের অস্তোন্মুখ সঙ্কীর্ণ রক্তগুচ্ছের গায়ে স্থির রাখিয়া পুনরায় পিতার দিকে ফিরাইয়া বলিল, আমি কি তাই বলছি? মা তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, দিন রাত তোমার কথা বলেন—তাই। তার জন্যে যে তুমি বাবাকে ভালবাসো না তা কি বলছি? না, বাবার কাছে আসতে তোমায় নিষেধ করেছি? আমি একজন দূতের কাজ করলাম, এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি বুঝবে। নিমুদা যে আজ সকালে এলে না? আমার তো সপ্তাহে একটা দিন মাত্র গান শেখা, তাও যদি তুমি না শেখাও তবে আমার কিছু হবে না।

অবশেষ কথাগুলি নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া শেষ করিয়া মীনা পিঠের উপর উমেশবাবুর হাতের স্নেহস্পর্শ পাইয়া উৎসুক নেত্র ফিরাইতেই উমেশবাবু বলিলেন, তুই তো কোন কিছুর খবর রাখিসনে মীনু, নির্ম্মল কাল বিকেলে তোর টিউশানি ইস্তফা দিয়ে গেছে। তাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলাম, শুনলে না।

নির্ম্মল এতক্ষণ মীনার কথার উত্তর দিবার সময় খুঁজিতেছিল, উমেশবাবুর কথাটার পরিশিষ্টস্বরূপ বলিল, তুমি কি আর কোন মাষ্টার রাখতে পারো না মীনা? আমার এক অসুবিধা পড়েছে,—

তাহার কথাটা শেষ হইল না। মীনা চক্ষু দুটি বড় করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে কি তাই কথা ছিল নিমুদা! ফোর্থ-ইয়াব শেষ না হলে তোমার ছুটি নেই, তা' তুমি নিজেই বলেছ। সুমুখেই আই, এ পরীক্ষা,

সে কি হয়? আমি আর কোন মাষ্টারের কাছে নতুন করে পড়লে কিছুতেই পাশ দিতে পারব না। বিশেষতঃ এমন ভাল ইংরেজী জানিয়ে আর কা'কে পাব বাবা! তুমি আবার ওঁকে বলে কয়ে নাও!

কথা শেষ করিয়া সে উমেশবাবুর ওভার কোটের বোতামে আঙ্গুল দিয়া বৃত্ত টানিতে লাগিল। উমেশবাবুও ইহা জানিতেন। নির্ম্মল যে ইংরাজীতে অনার্স পাইয়া বি, এ পাশ করিয়াছিল এ কথা জানিয়াই তিনি মীনার অধ্যাপনার ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি নির্ম্মল কবি, গীতবাদ্যে পারদর্শী। এই সমস্ত কারণে তিনি নিজেও নির্ম্মলকে জবাব দিতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে অজিতের জন্যই নির্ম্মলকে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি অজিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল অজিত, মীনুর এই সেকেণ্ড ইয়ারের পরীক্ষা—এখন কি নির্ম্মলকে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে?

অজিতের দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া তিনি মীনার পিঠে হাত বুলাইয়া ইঙ্গিত করিলেন, যাও তো মা, ওদের চা এখানে আসবে কিনা জেনে এসগে।

পিতার আদেশমত মীনা তাহার দীর্ঘ গ্রীবা দুলাইয়া দরোজার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু সুমুখেই তাহার মা সুকুমারীর পশ্চাতে দুইজন ভৃত্যের হাতে চায়ের কেটলি, বাটি প্লেট সাজানো ট্রে ও পিরিচে চপ কাট্‌লেট্ কাটাফল ইত্যাদি লইয়া আসিতে দেখিয়া সে বাহিরে যাওয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বলিল, এই যে মা এসেছেন।

সুকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আগন্তুক তিনজন উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার দ্বারা অভিবাদন করিল। সুকুমারী মন্থর শান্ত পদক্ষেপে একেবারে উমেশবাবুর পার্শ্বে কুশন চেয়ারে উপবেশন করিয়া, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া, মীনার দিকে চাহিয়া সস্নেহ গভীর কণ্ঠে বলিলেন, ওঁদের চা দাওতো মীনু! আমার বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। অজিত তো আমার হাতের জিনিষ না পেলে খেতেই চায় না—আর অত বড় মেয়ে যে আমার একটু সাহায্যে আসবে তা নয়,—

কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া উমেশবাবু বলিলেন, কেন, মীনু তো সবই পারে।

সুকুমারী প্রতিবাদ করিলেন, আমি কি বলছি সে জানে না? ওর পিসিমা যে ওকে হাতে ধরে এত করে রান্না বান্না জল খাবার, পিঠে বানানো শেখালেন তার কি? মেয়েকে একটিবার নিয়ে বসাও তো দেখি—বলবে, তোমরা বানাও আমি দেখব।

ইতিমধ্যে তিনি চাহিয়া দেখিলেন মীনা চা ঢালিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া খাবারগুলি তাহার অতিথিদের হাতে দিয়াছে। তাহাদিগকে খাইতে দেখিয়া তিনি অজিতের দিকে চাহিয়া হাস্যস্ফুরিত অধরে বলিলেন, তেমন ভাল হয়নি কেমন না? যে তাড়াহুড়ো—তা' ছাড়া আগেকার মত আর পারি না। বয়স তো হচ্ছে—তোমার মাসিমা আর কতদিন খাবার করে দেবে অজিত! তোমার পরীক্ষাও তো এই সীজনে—খুকীরও তাই। পরীক্ষাটা দাও বাবা, আমার মীনুকে তো আর ঘরে রাখতে ইচ্ছে হয় না। তোমার মার কি কোন অমত হবে বাবা!

তাঁহার কথা শুনিয়া অজিতের মুখ সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তাহার দিকে চাহিয়া মীনার সমস্ত কপাল তেমনি অকারণে ঘামিবার উপক্রম হইল। সে তাড়াতাড়ি চায়ের দুইটা বাটি আগাইয়া দিয়া কহিল, নিমুদা তো চা খায় না মা, আমি একবাটি গরম দুধ নিয়ে আসি।

বলিয়া সে তাহার সিঁদুরাভ কপোলের লজ্জা ঢাকিবার জন্যে কাহারও

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া একটি মূর্ত্তিময়ী বিদ্যুল্লতার মত ছুটিয়া গেল। অজিত চায়ের পেয়ালা ওষ্ঠে লাগাইয়া বলিল, মার মতামত এখনও নেবার সময় হয়নি মাসিমা—আমার নিজেরই এখন মত নেই।

সুকুমারী অজিতের শান্ত, দৃঢ় উত্তর শুনিয়া চক্ষের তারা ভ্রূর কাছে তুলিয়া একবার উমেশবাবুর দিকে চাহিলেন, পরক্ষণেই বিস্ময়বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, বল কি, তোমার মত নেই? কেন কি হ'ল—মীনু কি তোমাকে অশ্রদ্ধা করেছে? তোমার সঙ্গে কোন রূঢ় ব্যবহার করেছে? মীনু ও মীনি!

কাহারও কোন উত্তর আসিল না। অজিত হাসিয়া গৃহের অকস্মাৎ অপ্রাকৃতিক আবহাওয়াটা লঘু করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তা' নয় মাসিমা, মীনা কি আমার সঙ্গে কোন অপ্রিয় আচরণ করতে পারে? তাকে তো আমি জানি,—

সে যে তোমায় কত ভালবাসে তা কি আর অজানা আছে? বলিয়া সুকুমারী যেন কতকটা আশ্বস্তভাবে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, তা হলে তোমার অমতের কি আছে অজিত?

তাহার কথার মাঝখানে মীনা গরম দুধ লইয়া আসিয়াছিল। সে বাটিটা নির্ম্মলের হাতে তুলিয়া দিয়া দেবব্রতের দিকে চাহিয়া বলিল, দেবুদা যে চুপ করে আছ? তোমাকে আর একটু চা দিই?

বলিতে বলিতে সে দেবব্রতের বাটিতে চা ঢালিয়া দিল—দেবব্রত কোন প্রতিবাদের অবসর পাইল না।

এতক্ষণ উমেশবাবু মৌনমূর্ত্তিতে বসিয়াছিলেন অবশ্য, কিন্তু গৃহিণীর আলোচনাটা শুধু অজিতের সঙ্গে চলিতেছে—অথচ তাহার অপর দুই

বন্ধু ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া তিনি তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাজি মার্জ্জনা করিয়া মীনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি ওদের নিয়ে তোমার এগ্‌জিবিশন-রুমে বসগে। সেখানে তোমরা গান বাজনা কর, একটু শুনব'খন। আমি ওদিকের বারান্দায় একটু পাইচারী করি—বসে বসে পা একেবারে জমে যাচ্ছে।

তাঁহার কথায় সুকুমারী নিষেধ করিয়া কহিলেন, এই ঠাণ্ডায় তুমি বারান্দায় হাঁটবে কি গো! এই শীতে—এখনও কি তোমার নিজের শরীরটা চিনতে পারছ না?

উমেশবাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, কলকাতায় আবার শীত, পশ্চিমে যে শীত সহ্য করেছি তার তুলনায় কলকাতায় তো গরম!

ইতিমধ্যে বন্ধুত্রয়সহ মীনা পার্শ্বের দরোজা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল; সুকুমারী অজিতকে ডাকিয়া বলিলেন, অজিত, বাবা তুমি একটু এখানে বসো তো—তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

অজিতের ফিরিয়া বসিতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। মীনা পার্শ্বের ঘরে বসিয়া গান গাহিবে আর সে এখানে এই প্রৌঢ়ার সঙ্গে বিবাহের আলাপে যোগদান করিবে ইহা তাহার মত আমোদপ্রিয় লোকের পক্ষে নিদারুণ করুণাত্মক। কিন্তু মাসিমার কথাও এড়ানো যায় না। অগত্যা সে ফিরিয়া সুকুমারীর সুমুখের চৌকিতে বসিয়া বলিল, কি মাসিমা!

সুকুমারী উত্তর দিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। কেননা এদিকে উমেশবাবু পাইচারীর মতলবে উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে থামাইয়া পুনরায় বসাইয়া বলিলেন, তুমিও একটু বোসোনা গো! একান্তই বাইরে যেতে হয় তো বালাপোষটা এনে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

উমেশবাবু পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। সুকুমারী তাঁহার

দিকে দৃকপাত না করিয়া একেবারে সরাসরি অজিতের মুখোমুখি বসিয়া বলিলেন, দেখ, এখন আর ছেলেমানুষী কোরোনা অজিত! তুমিও যেমন বাপের একমাত্র ছেলে, আমার মেয়েও তেমনি আমাদের একটি। তোমাতে আর ওতে কেমন মানায় বল দেখিনি ?

বলিয়াই তিনি ভরা ভীত হাসির সকরুণ আভা ফেলিয়া উৎসুক নেত্রে অজিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অজিত কি বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ পাষাণ-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার জীবনের আনন্দ উৎসবকে সে কোনদিন বিবাহের মায়াচক্রে আবদ্ধ করিবে, তাহার মুক্ত উৎসারিত প্রাণধারাকে সে একটা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ বৃত্তে বেষ্টন করিবে এই কল্পনা করিতেও তাহার বত্রিশ নাড়ীতে টান পড়ে। তা'ছাড়া সে বুঝিত, নারীকে শ্রদ্ধা করা ভালবাসার মানে এই নয়, যে তাহাকে তাহার মুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিহার হইতে ছিনাইয়া আনিয়া আপনার স্বার্থ পূরণ করিতে হইবে। নারীকে ভালবাসিলে তাহাকে বৃন্তলগ্ন ফুলের মত রাখিয়া তাহার সুরভিস্নানে পরিতুষ্ট থাকিতে হয় আকাশের চন্দ্রকে ধরিয়া আনিয়া আপনার ক্ষুদ্র স্বল্পপরিসর গৃহকক্ষে বন্দী করার নাম ভালবাসা নয়, নারীকে ভালবাসিলে আপনার নিকৃষ্ট স্বার্থের দায়ে তাহাকে বিশ্বের বিশাল ক্ষেত্রে বিরাট ভালবাসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। পুরুষ যে স্থানে যে কালে একটি নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার তুচ্ছ পশুবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নারীকে ছলে বলে কৌশলে ভুলাইয়া, তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকের স্বাধীন প্রেরণার পথ রুদ্ধ করিয়াছে সেখানে কি নারীর উপর সত্যসত্যই অবিচার করা হয় নাই ? আর এখনও এই সভ্যতার সহস্র কিরণোদ্ভাসিত জগতে কি এই অন্যায় অবিচারের পুনরভিনয়ের জন্য নিজেকে দায়ী করিতে

হইবে ? তা হয় না এবং শুধু আজই সে এই কথাটা ভাবে নাই,—যে দিন হইতে তাহার সহিত মীনার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ মিলিয়াছে, যে দিন হইতে মীনার পিতামাতা তাহাকে মীনার ভাবী স্বামী কল্পনা করিয়া তাহাকে অপর দুই বন্ধু হইতে অধিক যত্নের পাত্র মনে করিতেছে তারও পূর্ব্ব হইতে সে এই সত্যটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাহার অন্তরের সঙ্কল্পটা এমন অনাবৃত সূর্য্যকরোজ্জ্বল মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন আসে নাই। তাই তাহার প্রতি যে উমেশবাবুর ও তাঁহার পত্নীর একটা ভ্রমধারণা থাকিবে ইহা অবধারিত। এ দিকে সে মীনার সঙ্গে অনেকদিন বিবাহ সম্পর্কে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছে, যে মীনাও কায়মনোবাক্যে তাহারই আদর্শটার সেবা করিবে। এই জোর পাইয়া সে অধিকতর মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাই সুকুমারীর কথার উত্তরে সে সরল সহজ কণ্ঠে বলিল, আমি বিয়ে করব না মাসিমা, কেবল যে মীনাকে বিয়ে করাতেই আমার আপত্তি তা নয়। বিয়ের কথাটাই আমার ভাল লাগে না। কাজেই আমি কোন মেয়েকেই বিয়ে করব না।

অজিতের কথাগুলি ক্ষুরের মত ধারালো এবং এমন চকচকে, যে চাহিতে গেলে বুঝি চক্ষু ঝলসিয়া যায়। শুনিয়া সুকুমারী এমনই বিস্মিত হইলেন, যে যদি কেহ তাহাকে ঠিক এমনিভাবে বসা অবস্থায় পাঁজাকোলা করিয়া বাহিরে বারান্দার রেলিঙ্ ডিঙ্গাইয়া কাঁকরখোলা পথের উপর ফেলিয়া দিত তবেও বোধ হয় তিনি এতদূর আশ্চর্য্য অনুভব করিতেন না। বিহ্বলের প্রায় উমেশবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, ওমা ছেলে বলে কি গো! বিয়ে না করে এ সংসারে কোথায় কে সুখ পেয়েছে ? না, অজিত, তুমি এখনও একটু চিন্তা করে বেশ বিবেচনা

নিয়ে ভাবতে শেখ। আমার মনে হয় মিনুর ওপর রাগ করেই তুমি এ সব কথা বলছ।

অজিত তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা চক্ষের ঔজ্জ্বল্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিল, এ কোন রাগের কথা নয় মাসিমা, আমার সুমুখে এই বিজলী বাতিটা যেমন স্নিগ্ধ আলো দেয় তেমনি আমার এই ভাবটাও আমার মনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেয়।

অজিতের উত্তরে সুকুমারী সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ব্যাহত হৃদয়ের হতাশ ভাবটা একটা দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে ঢালিয়া বলিলেন, কি জানি বাপু, আজকাল যে তোমরা সব কি ভাবতে সুরু করেছ আমি তার কোন দিশে পাচ্ছি না। কি গো, তুমি যে চুপ করে রইলে, অজিত ছেলে মানুষ, তার বুদ্ধিশুদ্ধি যেমন, আমি মেয়ে মানুষ আমারও তো তার চেয়ে বেশী বুঝাবার ক্ষমতা নাই। তুমি না হয় ছেলেকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল—বিয়ে না করবার কথাটা কি সহজ?

উমেশবাবুর উত্তর দিতে একটু গোল বাধিল। তিনি সাবেক কালের মানুষ হইলেও মডার্ণ যুগের যুবক যুবতী চরাইয়া তাহাদের চিন্তাধারার সহিত অল্পস্বল্প আদান প্রদান করিয়াছেন। অজিতের এই ভাবটা যে পুরুষের একটা খেয়াল এবং এই খেয়ালের ফলে যে পাশ্চাত্যের দাম্পত্যনীড় চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এই সত্যটাকেও তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রায় দশ মিনিটকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

৩

কিন্তু তিনি চুপ করিবার চেষ্টা করিলেও সুকুমারীর নাকি গলায় কাঁটা বিঁধিয়াছিল। তাই তিনি পুনরায় পূর্ব্বালোচনার ঢেউটা সমস্ত ঘরময় বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, তুমি এমনি করে চুপ করে রয়েছ—আর এ দিকে মেয়ের বয়স আঠারোয় থাকতে চায় না—আসছে ভাদ্রে কোন্ না উনিশে পড়বে। শেষে কি এই মেয়ে ঘরেই রেখে দেবে?

অজিতই কথাটার উত্তর দিল, মাসিমা, বিয়ে না হলেই কি মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখতে হয়? এতই যদি চিন্তা কর মাসিমা, তা হলে আমিই মীনার ভার নিচ্ছি—চিরকাল আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারব, কিন্তু বিয়ের কোন কথায় আমরা থাকব না এ কথা আগেই বলে দিচ্চি।

অজিতের অদ্ভুত কথায় সুকুমারীর মুখ হাঁ হইয়া গেল। উমেশবাবু এতক্ষণে কথা কহিলেন, তুমি যা বলছ তা অবশ্য আজকাল খুবই চলেছে, কিন্তু এটাও তোমার জানা উচিত অজিত, যে এ সব আমাদের দেশে এখনও শেকড় গাড়তে পারেনি। কেননা যে পর্য্যন্ত আমাদের মেয়েরা তোমাদের এই প্লেটোনিক প্রেমের আইডিয়াটা ঠিক ঠিক ধরতে না পারবে সে পর্য্যন্ত ও এখানে পাত্তা পাবে না। আমাদের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব ভাব, ভারতবাসীর জাতিগত কর্ত্তব্য, সামাজিক স্বাতন্ত্র্য যদি কিছু থাকে তবে তা এখনও আমাদের মেয়েদের মধ্যেই আছে। আমরা পুরুষরা নানা কাজের খাতিরে আমাদের চিন্তার কোনটা যে নিজস্ব তারই ঠিকানা হারিয়ে যেতে বসেছি, কিন্তু তারা এখনও তা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু ইদানীং তোমরা যা করছ তাতে একটা বিস্মৃতি

এনে দেবেই। তবে কালের চাকা ঠেকিয়ে রাখবে কে? এ আমরা আর কিছুই বলতে পারিনে। কিন্তু আসলে এই বিয়ে না করার ভাবটা আমার মনে হয় মানুষের ভোগের সংসারে উঞ্ছবৃত্তির কল্পনা থেকেই জাগে। অবশ্য এটা আমার নিজের একটা চিন্তামাত্র। তা হ'লে তুমি কি একেবারেই শেষ কথা বলছ?

অজিতের উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই সুকুমারী কথাটার আয়ত্ব বাড়াইয়া দিলেন, তা' কেন হবে, তা'ও কি কখনো হয়? ছেলেকে একটু চিন্তা করবার ফুরসৎ দেও তো!

তুমি অতো চিন্তা করো না সুকু, বিয়েটা সম্পূর্ণ নিয়তির হাতে তা'তো নিজের জীবনেই বুঝেছে, আর তুমিও একটু ভেবে দেখ অজিত।—কথাটা বলিয়াই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া বলিলেন, কই তুমি যে বালাপোষটা এনে দিলে না?

এই যে যাচ্ছি, বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা সুকুমারী অজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া মীনার ঘরের সম্মুখে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। তার পরে বালাপোষ আনিয়া উমেশ বাবুকে বলিলেন, তুমি অজিতকে অত কড়া কথা বলোনা বলে দিচ্ছি।

উমেশ বাবু বালাপোষ জড়াইয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন—ঘাড় ফিরাইয়া গম্ভীর বদন আরও গম্ভীর করিয়া কহিলেন, এর মধ্যে কড়া কথাটা আবার কি হল? কথার পিঠে কথা, তা' বলতে হবে বৈ কি?

সুকুমারী যৌবনের কটাক্ষ হানিবার মত চক্ষু বাঁকাইয়া বলিলেন, একটু মোলায়েম করে বললে কেমন মিষ্টি শোনায় বলতো? দেখ অজিতের মত এমন বড় লোক কি সহজে মেলে? ভগবান মিলিয়েছেন—না হ'লে

আগ্রা থেকে আসবার সময় পথে গাড়ীতে কতক্ষণের পরিচয়, কিন্তু কেমন সেই থেকে ও আমাদের ভালবাসে, রোজ এসে মীনাকে কলেজ থেকে বাড়ী পৌছে দিয়ে যায়—এমন নিঃস্বার্থ ভাবে কেউ করে? তাইতো বলছি যা'তে হাতে রাখা যায় সে ভাবে মানিয়ে চলতে হবে।

দেখ সুকু, আমরা পুরুষ। আমাদের কথাবার্ত্তা কোন বাঁশীর সুরের মত মেয়েলী হবে না। কথা বলতে গেলেই তোমার কানে যদি খারাপ ঠেকে, এখন বুড়া বয়সে আমার গলার স্বর তোমার আর পছন্দ না হয়, তবে আমি কোন বিষয়ে ভাল মন্দ টু হাঁ করব না। মীনুর বিয়ের সব ব্যবস্থা তোমার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

বলিতে বলিতে তিনি বারান্দার দিকে চলিয়া গেলেন। সুকুমারী অন্য দিকে বাহির হইয়া একজন ভৃত্যের হাতে পান দিয়া আপন কক্ষে যাইবার সময় বলিলেন, এগুলো খুকীমণির ঘরে দিয়ে এসো প্যারী—আমার খবর নিলে বলো, কয়েক মিনিট পরে যাচ্ছি, বুঝলে?

যে আজ্ঞে, বলিয়া প্যারীচরণ পানের থালি আনিয়া মীনার এগ্‌জিবিশন-রুমে দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। মীনা তখন অর্গানে বসিয়া গানের সুরে তন্ময় ছিল। তাহার কথা বলার তখন কোন অবসর বিরল বুঝিয়া অজিত তাহার প্রতিভূস্বরূপ ভৃত্যের নিকট হইতে সুকুমারীর খবর আদায় করিল। প্যারীচরণও সুকুমারীর কথামত উত্তর দিয়া একটা কুঁজো নমস্কার দিয়া পূর্য-ডোরের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সমাগত তিন অতিথি মীনাকে অর্দ্ধবৃত্তের মত বেড়িয়া বসিয়া গান শুনিতেছিল। প্যারীচরণ আসিয়া তাহাদের নিবিড় আনন্দ সম্ভোগে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটাইবার পর মুহূর্ত্তেই দেবব্রত উঠিয়া দেয়ালের ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল। গান শেষে মীনা চেয়ার ছাড়িয়া আব্দারের ছন্দে

বলিল, আমার ভাল হচ্ছে না, তাইতো দেবুদা ছবি দেখতে গেলেন, আমি কি বুঝি না !

দেবব্রত গান শুনিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু কেতামাফিক ভালমন্দ অভিমত প্রকাশের আবশ্যকতা কোন দিনই অনুভব করে নাই। কিয়ৎক্ষণ আমতা আমতা করিয়া সে সহজ স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বলিল, কে বলে আমি অরসিক, তোমার গান যতদিন শুনেছি তার মধ্যে আজই সব চেয়ে ভাল লেগেছে মীনা, তুমি বরং আর একটা গাও—শুনি। আমি বেশীক্ষণ বসে থাকতে শিখিনি। তাই এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টায় থাকি —গানকে গান, ছবিকে ছবি।

পিঠের উপর হইতে কাল সাপের মত বেণীটা বুকের উপর আনিয়া মীনা অর্গ্যান হইতে কয়েক ইঞ্চি তফাতে নির্ম্মলের কাছ ঘেঁষিয়া অনুরোধ করিল, নিমুদা, একটা নূতন গান গাও—আমি শিখব।

মীনা চট করিয়া নির্ম্মলের ডান হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অজিত তাহার দিকে কটাক্ষ ফেলিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল, তোমাকে গান গাইতে বললে যদি নির্ম্মল গাইলেই চলে তবে আর মিছামিছি গান শিখে লাভ কি ? নির্ম্মল যে কি গান শেখাও তা'ও বুঝিনে !

কিন্তু অজিতের এই কথাটা যে নির্ম্মলের বুকের মধ্যে তীরের মত বিঁধিতে পারে ইহা বোধ হয় বক্তা অনুভব করিতে পারে নাই। বসিয়া বসিয়া নির্ম্মলের সমস্ত শরীরে অগ্নিদাহের প্রচণ্ড জ্বালা অনুভূত হইতেছিল, ইচ্ছা হইল, সে এই নীচ স্বার্থপর বন্ধুর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু মীনার দিকে চাহিয়া সে কোন উচ্চবাচ্য করিল না। সে মৃদু হাস্যে বলিল, তা বেশতো, এখন পরীক্ষার সময় গানটা কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ক্ষতি কি ?

মীনা নিজেও অজিতের কথাটা সভ্য-শ্রেণীতে ফেলিতে পারে নাই। শিক্ষাদানের ক্ষমতা অক্ষমতার ইঙ্গিত করিয়া নির্ম্মলকে খোঁচা দেওয়া যে অজিতের কোন মতেই উচিত হয় নাই, মীনা এই বিষয়টা অজিতকে বুঝাইয়া দিবার প্রেরণা অনুভব করিল। অথচ সঙ্গে সঙ্গে ভাবিল, তাহাদের দুই বন্ধুতে এত মধুর ভাব সত্ত্বেও যখন এরকম আঘাত এক তরফ হইতে সম্ভব হইয়াছে তখন ইহাতে তত গুরুত্ব আরোপ করিতে যাওয়াও বাচালতা। তাই সে নীরব রহিল। কিন্তু যখন দেখিল অজিতের এক কথায় তাহার গান শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় তখন সে অজিতের দিকে একটা তরল দৃষ্টি ফেলিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, হ্যাঁ, তা হলে আমার গান শেখা চুলোয় যাবে। কোথায় রোজ হত, সে স্থলে সপ্তাহে একদিন শিখব তাও বাদ। তুমি গানের কি বোঝ অজিতদা, গান শেখাটা কলেজের পড়া নয় যে খানিকক্ষণ পড়েই মগজে পুরে রেখে দিলেই চলবে—গান শিখ্‌তে হলে মগজে তো পুরতে হবেই, তার উপর গলা দিয়ে নানা বিভিন্ন রুচির মানুষকে এক করে নিতে হবে। নিমুদার গলা মিষ্টি, আমার ইচ্ছে হয় সব সময় ওঁর গান শুনি। গাও না নিমুদা—ওঠ!

বলিয়া সে নির্ম্মলকে ঠেলিয়া অর্গানের সুমুখে চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নির্ম্মলের ত্যক্ত আসনটি টানিয়া নির্ম্মলের কাছে বসিয়া পড়িল।

সমস্ত বিষয়টাতেই অজিত নিজেকে অপমানিত মনে করিল। কেননা এ সংসারে তাহার সহিত তুলনা দিয়া মীনা অপরকে উচ্চাসন দিতে পারে ইহা মীনার যোগ্যতার ওজনে সম্পূর্ণ অসমান। কারণ মীনা তাহাকে ভালবাসে। সেও মীনাকে ভালবাসে। মীনা তাহার কাছে যেমন সকল অসম্পূর্ণতা, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়াও অনিন্দ্যসুন্দরী, অনাবিল, সর্ব্বগুণ-ভূষিতা, সকল শক্তির ভাণ্ডার ; তেমনি তো সে নিজেও মীনার কাছে এই-

রূপই নিঃসংশয় বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীল হওয়া উচিত! কিন্তু তাহা না করিয়া মীনা তাহার দোষগুণ বিচার করিতে চায়, তাহাকে যাচাই করিয়া ভালবাসিতে চায়। যদি হিসাব করিয়াই ভালবাসিতে হয় তবে ইহার মধ্যে হৃদয়ের মুক্তি কোথায়! যদি প্রতি পদক্ষেপে স্কেলের পরিমাণে মাপিয়া ভালবাসার পথে অগ্রসর হইতে হয় তবে ইহাতে ডিভাইন প্রেমের কণামাত্র আভাসও থাকিতে পারে না, ক্ষিপ্রগতি প্রাণবাহিনী সেখানে কুলুকুলুনাদে তরতরবেগে জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে মুক্তির প্রতিধ্বনি তুলিয়া অসীম নীলাম্বুনিলয়ে ঝাঁপ দিতে পারে না—সেখানে ক্ষুধার অভয় নিবারণ নাই—তৃষ্ণাকে গাঢ় নিশীথের পরস্বাপহারীর ন্যায় সঙ্কীর্ণ পথপার্শ্ব হইতে অমৃত সঞ্চয়ন করিতে হয়—ইহা কোনকালেই ভালবাসা হইতে পারে না। ভালবাসা যেখানে দিব্য সৌরভে স্নিগ্ধ, দ্বিধা সেখানে আবেগের পদতলে আত্মদান করে। তবে কি মীনা তাহার গুণাগুণ বিচার করিয়া তাহাকে ভালবাসে? কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ বাক্যহীন মডেলের মত বসিয়া সে কৌতূহল-ভরে মীনার দিকে চাহিয়া রহিল। মীনার দীর্ঘায়ত চক্ষু, ইহা কি অবিশ্বাসের ভ্রূরেখায় কুৎসিত, মসৃণ চিক্কণ অলক কি বেণীর মধ্য দিয়া কাল ভুজঙ্গিনীর অন্তর্দংষ্ট্রা লীলায়িত করে, ওই বঙ্কিম গ্রীবা—এর প্রতি তরঙ্গ কি কুটিলতার আঘাতে দুর্ব্বল, এই বাণীহীন প্রসন্ন মুখ, ইহার গোলাপী মাধুর্য্য কি মরু-প্রান্তরের মায়ামরীচিকা? ঐ ঈষৎকম্পিত ওষ্ঠ দুটি কি মোহমদিরার পরিবর্ত্তে হলাহল বহন করে? ওই স্নেহমণ্ডিত কোমল হস্ত দুটি কি প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিতে কপট? ওই গতিহীন স্খলিত পদতলে কি সরল শান্তির কোন ইঙ্গিত নাই? তবে ওই রহস্যময়ী মীনা, তাহার ধ্যানের দেবী মীনা, তাহার আপন জীবনের সকল সম্ভাবনাকে আরাধনার নির্ম্মাল্যের মত তাহার দিকে সর্ব্বদাই ঢালিয়া দিতেছে কিসের জন্যে?

ভাবিতে ভাবিতে অজিতের অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কানন-সংলগ্ন নিবিড় অমানিশার মত নিরাকার, মগ্ন সূচীদুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। সুমুখে নির্ম্মলের সুমধুর গীত অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছিল; কিন্তু তাহার একটা রেশও অজিতের কর্ণপটে প্রবেশের পথ পাইল না। সে মোহাবিষ্টের ন্যায় উঠিয়া কোন দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া বারান্দায় উমেশ বাবুর সঙ্গে গিয়া আলাপ জুড়িয়া দিল।

কিন্তু তাহার অকস্মাৎ গৃহত্যাগের বৈসাদৃশ্যটা গৃহবর্ত্তী অপর তিনটি প্রাণীর কাছে এমনি নীরসভাবে আসিয়া বাজিল, যে নির্ম্মল যে সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল এ বিষয়ের কোন প্রশ্ন কাহারও পক্ষ হইতে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেল না। এই ভাবে বসিয়া থাকাও অশোভন, তাই দেবব্রত আগে কথা কহিল, মীনা তো গান বেশ শিখেছে কিন্তু মাষ্টারকে ধরে সাহিত্য-চর্চ্চার কতদূর কি একবার দেখিনা।

অপর দুইজনে যেন এতক্ষণ অকূল জলধিতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিল—অকস্মাৎ দেবব্রতের কথায় ডাঙ্গার সন্ধান পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মীনা দেবব্রতের কথার উপর বলিল, কোথায়, নিমুদা আর আমাকে কিছু শেখান না। উনি নিজেই সব ছেড়ে দিয়েছেন।

দেবব্রত বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিল, কি হে, তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ নাকি, তা'তো জানিনে! তোমার এত সাহিত্যচর্চ্চা কি শিকেয় উঠল?

নির্ম্মল কিছুক্ষণ এমনিভাবে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল যেন তাহাদের কোন কথা তাহার কর্ণে গিয়া সাড়া তুলে নাই। কিন্তু ইহার যে কোনই কারণ ছিলনা তা নয়। সংসারে অতি তুচ্ছ নগণ্য ঘটনার ভিতর দিয়া যে একটা বিরাট সত্যের নিছক চিত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে নির্ম্মল তাহাই

ভাবিতেছিল। অজিতের অনতিপূর্ব্বে ছোট-খাট ব্যবহারগুলি যে কোন এক সুগভীর প্রত্যয়-সমাধি হইতে মাথা তুলিয়াছে এবং ইহা যে এই তিনটী বন্ধুর জীবনের সহজ মিলনের প্রতিছন্দে অনৃত, অসত্যে বিচ্যুতি ঘটাইতে পারে ইহা অনুভব করিয়া নির্ম্মল বিমূঢ়, নির্ব্বাকভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। অজিত হয়তো মনে করে, যে নির্ম্মল মীনার অকলঙ্ক প্রণয়ের প্রত্যাশী; তাই যখনই তাহার সঙ্গে কোন ঘনিষ্টতা প্রকাশ করিয়াছে তখনই অজিতের মন বিদ্রোহ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সেদিনও ঠিক এমনিভাবে অজিত তাহাকে মীনার সুমুখে ছোট করিবার জন্যে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে—সে দিন এই নির্লজ্জতা তাহার অসাক্ষাতে ঘটিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সকল আত্মমর্য্যাদাকে বেত্রাঘাত করিবার ভাব দেখাইয়া অজিত এস্থান ত্যাগ করিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মল মনে মনে ঠিক করিল, অজিত যদি এমনই ভাবে তবে আর সে কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিবেনা—কাল হইতে নিশ্চয়ই এ-বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিবে। নির্ম্মল হয়তো আরো ভাবিত, কিন্তু দেবব্রত পুনরায় কথা বলিল, জিজ্ঞাসা করিল, কি হে, এত ভাবনা কিসের—বলি কবিতা লেখা যদি ছেড়েই দিলে তবে এত চিন্তা করতে হয় কেন?

নির্ম্মল যেন স্বপ্নোত্থিতের মতই জাগিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, না তা ঠিক ছাড়িনি। তবে আজকাল উপন্যাসের দিকে একটু ঝোঁক দিয়েছি।

মীনা নির্ম্মলের কথাটা বৃক্ষচ্যুত ফলের মত লুফিয়া লইয়া বলিল, জান দেবুদা, আজকাল সাহিত্যে নাকি কোন নীতি নেই, তিনি নীতিবাদের যৌক্তিকতা প্রচার করবেন। কি বল নিমুদা তাই নয়?

হ্যাঁ একরকম তাই বটে, বলিয়া নির্ম্মল কয়েক মিনিট নিঃশব্দে থাকিয়া

চাহিয়া দেখিল, সুকুমারীকে সঙ্গে লইয়া অজিত পুনঃ প্রবেশ করিতেছে। সুকুমারীকে দেখিয়া তাহারা তিনজনেই উঠিয়া অভিবাদন করিয়া বসাইল। সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে পরে নির্ম্মল দেবব্রতের কথাটার অস্তিত্ব-জ্ঞাপনস্বরূপ উত্তর দিল, আজকাল বইয়ে পত্রে চারিদিকে দেখতে পাই মেয়েদের খুব খাতির করা উচিত। আব আমাদের বাঙ্গলা বইগুলোতে রিয়ালিটী বলে একটা ধূঁয়া উঠেছে। অবিশ্যি এটা পশ্চিমেরই একটা বিকৃত বুদ্ধির আধিপত্য। একটা কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি, যে বুদ্ধি না হলে দুনিয়ায় বাস করা চলে না সত্যি, কিন্তু বুদ্ধির কোন শাসন-ক্ষমতা নেই ; সে ক্ষমতা পাবার জন্যে বুদ্ধিকে ধর্ম্মের দিকে হাত পেতে বসে থাকতে হয়। আমি শুধু বলি, ধর্ম্মটাকে শাসক রেখে বুদ্ধি পরিচালনা কর। তা হলেই দেখবে এই পাশ্চাত্যের নারী-আন্দোলনের মিথ্যা মুখোস এক দিনেই ঘুচে যাবে। সাহিত্যে এই রিয়ালিষ্টের নামে যে নারী-স্বাধীনতা দেবার প্রয়াস এটা নিছক অনুকরণ।

দেবব্রত যেন কথাটা হাল্‌কা ভাবেই উড়াইয়া দিতে গিয়া কহিল, দেখ সংসারে কালস্রোত বলে একটা জিনিষ আছে তার হাত থেকে কারও বাঁচোয়া নেই।

নির্ম্মল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কালস্রোত কোন দিন মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না। সাহিত্যে অশ্লীলতা, সমাজে ব্যভিচার, স্বাধীনতার নামে নারীর মাতৃত্বের প্রতি অবজ্ঞা এগুলো কি কালস্রোত বলে চালাতে চাও দেবু? আমাদের মজ্জায় মজ্জায় বানর-বৃত্তি, তাই আমরা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারিনে, আপনার মানদণ্ড ভুলে রাখতে পারিনে, ধ্বংসস্রোতের কাছে পরাভুত হই আর এই মৃত্যুস্রোতটিকে কালস্রোত বলে চালিয়ে নিই। অন্যথা যাদের ধ্বংসের আবর্ত্তে আমরা

পথ হারিয়ে বসে আছি তারা যে নারীর সম্মান কোথায় কেমন করে রাখছে তা ঠিক ঠিক ধরতে পারা যেত।

এতক্ষণ অজিত তাহাদের আলোচনার বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে নির্ম্মলের কথার উত্তরে বলিল, এত লুকোচুরির মধ্যে গিয়ে তো কাজ নেই—সোজা বল, যে প্রতীচ্য দেশ নারীর সম্মান রাখতে জানেনা, কেননা তারা নারীকে পুরুষের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে জাগতে বলে, তাকে তার যথার্থ সম্মান দিতে বলে। আমরা যারা মেয়েদের জীবনের সকল ভবিষ্যৎ চুকিয়ে দিয়ে ষোল বৎসর বয়সেই—যে সময়ে তাদের দেশের নারী এক একটি প্রাণের, রূপের, আনন্দের, যৌবনের আধারস্বরূপ, সে সময়েই আমরা তাদের অকর্ম্মণ্য করে তোলবার আয়োজন করি।

নির্ম্মল অপলক চক্ষে সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল, সকলেই যেন অজিতের কথাটা খুব অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে কেবল সুকুমারী ছাড়া। সে অজিতের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল, দেখ অজিত আমরা মেয়েদের যে ভাবে দেখি তারা সে ভাবে চায় না। আমরা চাই নারীকে স্নেহ মমতা করুণা কল্যাণের জননীরূপে, আর তারা চায় শুধু লালসার শান্তিরূপে, বিলাসের যন্ত্ররূপে, একমাত্র ভোগের সহকারিণীরূপে, এর জন্যেই তারা বিলাস-সামগ্রীর মতন নারীর যৌবনটা নিয়ে গর্ব্ব করে; কিন্তু তা ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনটা একটা ছিন্ন বস্ত্রের মত অসার অকর্ম্মণ্য হয়ে ওঠে। তারা যেভাবে নারীকে সম্মান করে তার নমুনা দেখতে চাও তো নারীর নির্লজ্জ ছবি মাঝ খানে রেখে তাদের ব্যবসার বিজ্ঞাপন দেখ, তাদের অশ্লীল নৃত্য দেখ, তাদের সাহিত্য দেখ, দেখবে তাদের নারীর সঙ্গে যে মিথ্যা সম্ভোগের সম্বন্ধ সেগুলো তারই অনলে রঙীন। যে দেশের মানুষ নারীর উলঙ্গ ছবি দেখিয়ে, নারীর অর্দ্ধোলঙ্গ নাচ দেখিয়ে পয়সা

নিতে পারে তাদের গতানুগতিকতা নেবার পূর্ব্বে তোমার মাথা কি লজ্জায় হেঁট হয়ে যাবেনা? মাকে এমন শতাদিক হতে পঙ্কিল করবার আগে কি একটিবার ভেবে দেখবেনা, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা তাঁদের কি চক্ষে দেখতেন, কোন্ অনুভূতি থেকে তাঁদের মধ্যে মহাশক্তির দ্যোতনা পেতেন, কেনই বা তাঁদেরকে বিশ্বের জননী বলে সম্মান করতেন! তা না করে তোমরা আর্টের খাতিরে আর্ট প্রচার করতে গিয়ে সমুদ্রের সকল জল সেঁচে ফেলে দিয়ে তার গোপন রত্নগুলি চিরদিনের জন্য চক্ষের সামনে এনে রেখে দেবে, অনন্ত জলরাশি দিয়ে যদি এই রত্নগুলি ঢাকা না থাকত তবে কি ওদের কোন মূল্য থাকত, তারাও সামান্য নুড়ির মত অবহেলার সামগ্রী হয়ে থাকত; বাজনার ক্ষেত্রে যেমন অনাঘাত রূপটি তালের চরম পরিণতি, তেমনই প্রতি আর্টের ক্ষেত্রেই একটি অনাঘাত অর্থাৎ অদৃশ্য সৌন্দর্য্য রয়েছে তাকে অপ্রকাশ্য রাখই আর্টের অধ্যাত্ম-প্রদর্শন। তাই বলি আর্ট সেখানেই সার্থক হয়েছে, যেখানে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে গিয়ে কোন অবিচার হয়নি।

নির্ম্মলের কথা সকলেরই মনের মধ্যে কেমন একটা ওলট পালট আনিয়া দিল। তাহারা শান্ত অচঞ্চল মূর্ত্তিতে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। আর সকলের যেমন মাদকতা আসুক, সুকুমারীর বেশীক্ষণ এসব কথার মধ্যে থাকার ইচ্ছা হইল না। অজিতকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন, অজিত, তোমরা এখানেই খেয়ে যেও, আমি আয়োজন করাচ্ছি, কেমন?

অকস্মাৎ অপর সকলেই চকিত দৃষ্টিতে টেবিলের উপর ক্লকের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যকণ্ঠে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, এ্যাঁ! এ যে নটা বেজে গেছে!

সঙ্গে সঙ্গে তিন বন্ধু যাইতে উদ্যত হইল। সুকুমারি তাহাদের সুমুখে আসিয়া বলিলেন, তোমরা আর একদিন এস বাবা, এখানে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা রাখব।

অজিত চৌকাঠের পারে আসিয়া বলিল, আসছে রবিবার ছাড়া তো হয় না মাসিমা !

মীনা তাহাদের সঙ্গে বারান্দার সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, সে প্রতিধ্বনি-স্বরূপ উত্তর দিল, আসছে রবিবারই ভাল মা, আমার ও অবকাশ থাকবে।

কথাটা শেষ করিয়া মীনা রেলিং ঝুঁকিয়া রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল, তাহারা তিনটি বন্ধু ক্রমে ক্রমে ধূসর রাত্রির কোলে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪

নারী-প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া নির্ম্মল আর কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে না পারুক মীনা যে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বুঝিয়া খুব সমঝদারী দৃষ্টিতে তাহার কথা গিলিতেছিল একথা ভাবিয়া সে গর্ব্বিত চিত্তে মেসে ফিরিয়া আসিল। রাত্রে আহারের পর সে তাহার কক্ষটিতে একান্ত একাকী বাস করার সময় তাহার মনের সবুজ কল্পনাগুলির গায়ে অনেক রকম সোণালি আলোর স্পর্শ পাইয়া প্রশান্ত চিত্তে নিদ্রা যায়। তাহার ঘরের মধ্যে প্রাণী বলিতে এক সে—তা' ছাড়া একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, তার কাছে একটা লোহার চেয়ার গায়ের ছাল ছাড়াইয়া বসিয়াছে। দুইটি দেওয়াল যেখানে একস্থানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাদের দু'টীর মাঝে একটা দড়িতে নির্ম্মলের কাপড় জামা, চৌকিটার নীচে একটা আধ-ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ, তা' ছাড়া কতকগুলি বই, ক্ষুর, কাঁচি কালীভরা দোয়াত কলম আয়না, ছোট ছোট শিশি—আর একটা জিনিষ তার থাকিয়াও নাই, কেননা দেওয়ালে একটা বেহালা ঝুলানো আছে বটে কিন্তু সে ইহা বাজাইতে শেখে নাই। সে শুইয়া শুইয়া প্রতিদিন ভাবে, মীনা যখন আই-এ পাস দিবে তখনই হয়তো অজিতের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে। সে সময় সে আর মীনার সঙ্গলাভ করিতে পারিবে না—এখন তবু সে টীউশনির অছিলায় মীনার সাহচর্য্য পায় তা'ও বিবাহের পরে সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে। এমনি করিয়া প্রতিদিন সে ভাবে, সহসা আনন্দস্রোত উদ্বেল অধীর বেগে জোয়ারের মতন তাহার চিত্তখানি কানায় কানায় ভরিয়া তোলে, অকস্মাৎ সে মাথার বালিশটা বুকের তলে চাপিয়া

চোঁখ কান বুঁজিয়া নিজের সুগভীর অন্তরের ভাগ্যবান সত্ত্বাটীর দিকে চাহিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করে। ভাবে, মীনা তো শুধু অজিতকেই ভালবাসে না—তাহার প্রতি মীনার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাহাকে পাইলে মীনা যেরূপ অকারণে উল্লসিত হইয়া উঠে এসবের কি কোন গূঢ় ইঙ্গিত নাই? মীনা কি তাহাকে ভালবাসিতে পারে না? তাহাকে বরমাল্য অর্পণ করিতে পারে না? উদ্ভট কল্পনায় নির্ম্মলের মুখ ফাটিয়া পাগলের মত হাসি বাহির হইয়া আসে—তাহার দিব্য দৃষ্টির সুমুখে অজিতের তেমহলা প্রকাণ্ড বাড়ী, বিরাট জমিদারী, অর্থের প্রাচুর্য্য তাহাদের জুড়ি-মোটর এসব লোভনীয় স্বর্গভোগের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া মীনা কি তাহার দীর্ণ ভগ্ন কুটীরে আসিয়া বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া অনাড়ম্বর শান্ত জীবনের মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে অজিত লাফাইয়া উঠে, সুইচটা টিপিয়া কবিতা লিখিতে বসে।

কিন্তু আজ সে সন্ধ্যার সময় মীনার নিকট হইতে আসার পর একটা নিবিড় ভাবান্তর তাহাকে ভূতের মত চাপিয়া ধরিল। আজ মীনা অজিতকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে যেরূপ সম্মান দিয়াছে ইহাতে কি কোন মানুষ অন্ততঃ কোন যুবক এই যুবতীর জন্যে, তা' সে যত উচ্চেই থাকুক, হাত বাড়াইতে পারে না, বামন হইয়া চাঁদের দিকে কি হাত বাড়াইতে যাওয়া বাতুলতা! এক কাল ছিল যখন তাহাদেরও অর্থ ছিল। প্রাসাদোদ্যান অট্টালিকা ছিল, জুড়ি ছিল, যাহা আট ঘোড়ায় টানিত, যাহার বিশ্বকম্পনকারী শব্দে তাহাদের ধনের গর্ব্ব লোকের বুকে আহত হইয়া দ্বিগুণিত হইয়া উঠিত; আজ তাহার আর সে ধন নাই, সে গর্ব্ব নাই, সে মাদকতা নাই, সে প্রতিষ্ঠা নাই, সে গৌরব নাই, সে সম্মান নাই, আজ তাহার প্রতিপাদক্ষেপ মানুষের সুখ দুঃখ ভাল মন্দের হিসাবের

অধীন। একটা দীর্ঘ শ্বাস নির্ম্মলের সমস্ত বক্ষপ্রদেশ আলোড়িত করিয়া নির্জ্জন নিরালা গৃহের সমস্ত শান্তিটাকে বিষাক্ত অবসাদে ডুবাইয়া ফেলিল। মনে হইল, বিধাতার একি নিষ্ঠুর বিধান—যাহাকে একদিন রজতপাত্রে দুগ্ধ পানের সুযোগ দিয়াছিলেন আজ আবার তাহাকে এমন দীনতার বসনে ভূষিত করিলেন কেন? আজ যদি তাহার ঐশ্বর্য্য বিভব থাকিত তবে মীনার জন্য তাহাকে ভাবিতে হয়! মীনা যে তাহাকে ভালবাসে এ বিষয়ে সংশয় করিবার তো কোন কারণ নাই। অকস্মাৎ ভাবিল, একদিনে কি মানুষ বড় লোক হইতে পারে না? লটারির টিকিট কিনিয়া যদি এক লাখ টাকা সে পায় তাহা হইলে সমস্ত টাকা মীনার পদতলে ঢালিয়া তাহার অযোগ্যতার পাপ দূর করিয়া মীনাকে তাহার প্রেম নিবেদন করিতে পারে। এমনি করিয়া তাহার সুখদ, মনোরম অথচ অবসাদবহনকারী চিন্তাগুলি তাহাকে শত দিক হইতে অক্টোপাশের মতন জড়াইয়া ধরিল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ছাতের উপরে গিয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

পর দিন গেল—আরও ছয় দিন কাটিল। প্রতিদিনের চিন্তাব পর সে মনে মনে সাব্যস্ত করিল, মীনাকে তাহার চাই। মানুষের জীবনে দুইটী সময় আসে যখন কোন একটা লোভনীয় ঘটনা জীবনের অপরিহার্য্য উত্তাপ পাইয়াও দুই বিরুদ্ধ ফল প্রসব করে। কিশোর বয়সে বহু বালিকার সংস্পর্শে আসিলে চিত্তবৃত্তি অজ্ঞাতভাবে তাহাদের খেলার সাথী হইয়া মদির মোহে দিন কাটাইয়া দেয়—পাওয়া না পাওয়ার কোন কল্পনা তাহার কাছে কেন্দ্রীভূত হয় না—আবার বার্দ্ধক্যে একটি অবস্থা আসে যখন অক্ষমতার ক্রন্দন নারীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া মরে অথচ পাওয়ার মত সাহস সে হৃদয়ে জাগে না—এ যেন সাধু সন্ন্যাসীর মেয়েদের প্রতি কটাক্ষপাতের মত নীরব ভীত লালসার উন্মেষ, অবশ্য এখানে প্রকৃতির

স্বগতির আবর্ত্তনের অব্যর্থ নিষ্পত্তি। কিন্তু এ দুইয়ের মাঝে যে অন্ধ প্রবৃত্তি মানুষকে ক্ষুদ্র নীরব কুণ্ঠা হইতে ঠেলিয়া পৃথিবীর চির সুন্দর চির মাদকতাপূর্ণ শস্যসম্ভব ক্ষেত্রে নিদারুণ কর্ম্মের ঘূর্ণীতে বিলিপ্ত হইবার জন্য প্রেরণা দেয় সে সময়টা, সেই যৌবনের বেহিসাব পর্ব্বটা মানুষের নির্লিপ্ততার সকল রুদ্ধ দুয়ার যেন যাদুকরের মত খুলিয়া দেয়। হঠাৎ কখন যে এই যৌবনের কামনাস্ফীত সোনার কাঠি আসিয়া মানুষের চিররিক্ত অনাস্বাদিত প্রেমের ছবিটিকে জীবন্ত করিয়া তুলে তা' কেউ অনুভব করিতে পারে না। এ সময়ে যে নারীকে ভাল লাগে তার জন্যে মনের দুই বাহু অগ্নিপথেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়।

নির্ম্মলেরও এক সময় ছিল—যখন তাহার অর্থ ছিল—যখন সে তাহার বিত্তগৌরবের ফলে বহু মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু তার কোন কাল চিহ্ন মনের এক কোণাও অধিকার করিয়া নাই। আশ্চর্য্য, মীনার সঙ্গে তাহার মাত্র ছ'টি মাসের পরিচয়। এই ছয় মাসেই তাহার অজ্ঞাতসারে একটি ক্ষুদ্র কামনা তাহাকে অহর্নিশি ইহার রঙমহলার স্বপ্নময় চূড়ার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অনেক সময় তাহার এই চিন্তা উগ্রতর হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন ভোঁতা করিয়া ফেলিয়াছে—আবার ক্ষণে ক্ষণে একটি ক্ষীণ বিদ্যুতের মত অজিতের সহিত মীনার ঘনিষ্ঠতম অসহ্য বন্ধুত্বের দৃশ্যটি তাহাকে বজ্রমুষ্টি দেখাইয়া শাসাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার মনের একমুখী ঝোঁকের সাহায্যে ইহাকে ঢেউ দিয়া সরাইয়া সে নিজেকে মীনার সুবেশ উজ্জ্বল কান্তির একান্ত সন্নিকট করিয়া বসাইয়া আত্মতৃপ্তির প্রসাদ লাভ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এমনি করিয়া কারণে অকারণে তাহার বিষাদ-মেঘের মায়াবন্ধ কাটাইয়া, তাহার দুরাশার রবিটিকে নগ্ন সৌন্দর্য্যে লক্ষ্য করিয়া কত দিন যে সে একটা উত্তপ্ত বক্ষ

লইয়া মীনার বাড়ী গিয়াছে আসিয়াছে তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। আজিকার বিষাক্ত কটু তিক্ত অবস্থাটীও তেমনি ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মত তাহাকে দোলা দিয়া গেল। সে সপ্তাহান্তে মীনার দর্শন-সৌভাগ্য লাভের আশায় নিবিড় স্বস্তি লইয়া নীচে আসিয়া অকাতরে ঘুমাইল।

একটি রাত্রের ব্যবধানে যেন তাহার মনের সকল দ্বিধা সঙ্কোচের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে পর দিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই একটা নব আবিষ্কারের আনন্দে সম্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল। মীনাকে যেন আর তাহার একান্ত আপনার ছাড়া দূরে ভাবিবার কোন কারণ নাই। এই উন্মাদনা, এই প্রখর চেতনা তাহার দিনটাকে অক্লান্ত করিয়া রাখিল। কেমন করিয়া তাহার জীবনের বিনিময়ে মীনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহাকে আপ্রাণ ভালবাসিতে হইবে, এই মিশনের সৌকর্য্যার্থে যদি তাহাকে কোথাও চাকুরী করিতে হয় তাহার জন্য উদ্যোগ আবশ্যক। এই ভাবিয়া সে দরোজা বন্ধ করিয়া পত্রিকার ওয়ান্‌টেড্‌ কলম দেখিয়া দরখাস্ত পেশ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সকল শান্ত, সমারোহলেশশূন্য জীবন যাত্রার সিঁড়ি সমৃদ্ধি পাইয়া বিরাট প্রাসাদের মর্ম্মরস্তরে পরিণত হইল ; তাহার দীর্ঘ অবসরময় দিবসের পরিসর কমিয়া কর্ম্ম-কোলাহলে ভরিয়া উঠিল, যেন তাহার আর মরিবারও অবসর বিরল, কাজ, কাজ—কেবল সহস্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে চক্‌চকে রৌপ্য মুদ্রার শ্রবণরোচক ধ্বনিটি তাহার একমাত্র অবলম্বন।

এমনি করিয়া সপ্তাহক্ষেপ করিযা সে মীনার বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্যে রবিবারে গিয়া হাজির হইল। সন্ধ্যার স্বভাবশান্ত আকাশটি যেন সহস্র মেঘের অন্তরাল হইতে তাহাকে আশ্বাসবাণী প্রেরণ করিল। শীতের কুহেলীধূসর কলিকাতার চঞ্চলতা, নিয়মবদ্ধ বিক্ষিপ্ততার

মধ্যেও সে একটা সুমধুর শ্রান্তিহীন ভবিষ্যতের আস্বাদনে আপ্লুত চিত্তে আসিয়া যখন মীনাদের ড্রইং রুমে প্রবেশ করিল, তখন ঐ সুকেশিনীর মিশ্‌ মিশে কালো বিস্রস্ত কেশের সঙ্ঘবদ্ধ জমাট প্রশস্তির উপর তাহার দুই কৌতুকবিপন্ন চক্ষু কিসের সন্ধান পাইয়া লাফাইয়া উঠিল তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। সে ঘরে ঢুকিতেই মীনা তাহাকে বসাইয়া মুখোমুখী বসিয়া বলিল, আচ্ছা নিমুদা, প্রকৃতির সঙ্গে জীবনকে ঢেলে দেবার মধ্যে কি কোন পরাভব স্বীকার করতে হয়না? যারা সংসারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চায় তারা কি প্রতি পদেই অন্ধের মত চলতে পারে?

নির্ম্মল কিন্তু আসলে এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বসিয়া গায়ের র‍্যাপারটা গুছাইবার ভাণ করিয়া একবার বিস্তৃত চক্ষে মীনাকে দেখিয়া লইল। মীনার স্বভাবসুন্দর মুখের উপর যেন কে এক পোঁচ কালী লেপিয়া দিয়াছে। টেবিলের উপর একটা বই আধ খোলা অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। সে বইখানি তুলিয়া বলিল, এই বই পড়ে বুঝি তুমি এ সব জটীল তর্কে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলেছ? আমার মনে হয় কি জানো?

মীনা চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া কহিল, কি বল তো!

যাদের কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে, সংসারে তারা প্রকৃতির সাথে গা এলিয়ে চলে না, তারা সব সময়ই নিক্তির ওজনে চলা-ফেরা করতে শেখে। যাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, আসলে যারা ভবিষ্যৎ মানতে চায়না তারাই স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে পারে; কিন্তু এমন নিঃসহায় যারা তাদের দ্বারা সংসার কোন কালেই কল্যাণের আশা করতে পারেনা।

নির্ম্মলের কথাটা যেন মীনাকে সমাশ্বস্ত করিল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,

তাই না? তবে যে অজিতদা বলতেন, জীবনের কোন হিসেব রেখে চলার মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য নেই, কোন সার্থকতা নেই!

নির্ম্মল ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা একটা অতি ছোট ঘটনা দিয়েই তোমাকে বলা যাক। ধরো একজন ছবি আঁকেন। তিনি যদি তাঁর তুলির আঁচড় ওজন রেখে না ফেলতে পারেন তবে কি কেউ তার ছবির পরিপূর্ণতা স্বীকার করবেন! তুমি যে বেশবিন্যাস কর তা যদি সিস্‌টেমকে জবাই করে হয় তবে কি তোমারই নিজের মনে বেখাপ্পা ঠেকবেনা! ঠিক এমনি রকম মানুষকেও তার প্রতি কর্ম্মে প্রতি বাক্যে সিস্‌টেম রেখে সঙ্গতি রেখে চলতে হয় অন্যথা তার কোন কাজই ছন্দময় হবে না। প্রতি রাত্রির পরে প্রতি দিন আসে, প্রতি দিনের সূর্য্যের পরে কাজটি চলন্ত ট্রেণের কামরার মতন এসে জুটে অন্যথা কোন কাজও যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না—অবসরও দুর্ঘট হয়ে ওঠে। প্রকৃতি মানে কোন একটা খেয়াল নয়—এ একটা বৈচিত্র্য, এর মধ্যেও একটা সুবিন্যস্ত গতি আছে, একে যারা অস্বীকার করে তাদের মনের জোর বলে কোন জিনিষ থাকে না, তাদের সঙ্গে সংসারে তাল রেখে চলতে গেলে হয় ভরাডুবি হবে নয়তো স্থবির হয়ে বসে থাকতে হবে।

বলিতে বলিতে নির্ম্মল চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বের পর্দ্দা সরাইয়া সুকুমারী প্রবেশ করিলেন। সে উঠিয়া তাঁহাকে আসন নিবেদন করিবামাত্র সুকুমারী বলিলেন, আজ ক'দিন ধরেই অজিতকে দেখতে পাচ্ছিনে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিশ্চয় নির্ম্মল, সে কি আমাদের পরে কোন অভিমান নিয়ে বসে আছে কি না দেখা দরকার।

নির্ম্মলের মাথার যেখানে যত আবিলতা এতক্ষণ মীনার কথার জালে ঘুরপাক খাইতেছিল সেগুলি যেন মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া মীনার চিন্তা ও

প্রশ্নের কারণটি স্বচ্ছ নির্ম্মল সরোবরের নীচেকার শৈবালের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সুকুমারীর দিকে চক্ষু রাখিয়া বলিল, তাতো জানিনে মাসিমা, গেল রোববারে যে আমরা গেলুম তারপরে আমার সঙ্গেও তো দেখা হয় নি!

সুকুমারী উদ্ব্যস্তপ্রায় বলিলেন, কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো বাবা, তুমি একটিবার গাড়ী নিয়ে দেখে আসবে?

কথাটা অবশ্য ফর্ম্মালিটির কোন ধার ধারে না। কিন্তু মীনা এই অন্যায় প্রস্তাবটার উপর চাবুক মারিয়া বলিল, উনি কেন যাবেন? তুমি যে কি বলছ মা, নিমুদা এইমাত্র কতদূর থেকে এলেন, আবার এখুনি কেন? অজিতদার হয় তো কোন বিঘ্ন পড়েছে।

তাহাকে শেষ করিতে হইল না। সুকুমারী যেন নিজের কথার কদর্য্যতা ধরিয়া বলিলেন, থাক বাবা, আমি যে কি বলি তা' কিছু বুঝতে পারছিনে। একটু চা খাও, দেখা যাক অজিত আসে কি না।

বলিয়া সুকুমারী যেমন অকস্মাৎ উদয় হইয়াছিলেন তেমনি ঝড়ের মতন মস্ মস্ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইলেন। মীনা অতিশয় বুদ্ধিমতী। এই ঘটনাটা যে নির্ম্মলের পিঠে একটা খোঁচা দিয়া যাইতে পারে এ জ্ঞানটা যেন তাহার প্রাপ্য। তাই সে তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলকে অন্যমনস্ক করিবার জন্যে বলিল, নিমুদা, সে দিন যে নতুন গানটা দিয়েছিলে সেটা আবার দেখিয়ে দাও, আমি একদম ভুলে গেছি।

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া নির্ম্মলকে একরকম জবরদস্তি করিয়াই অর্গ্যানের কাছে বসাইয়া তাহার ডান দিকে গোল টুলটিতে বসিয়া পড়িল। নির্ম্মল কিন্তু সত্যই একটা কথায় বিমর্ষভাবে আবৃত হইবার পথে যাইতেছিল। অজিতই যে একমাত্র সুকুমারীর লক্ষ্য, আর সে যে অজিতের একটি

শোভাস্বরূপ এ ভাবটা সুকুমারীর কথায় এত তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতায় ফুটিয়াছে যে ইহাকে আর অবিশ্বাস করা চলে না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, মীনার মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিব্যক্তির হেতুটা কি? কিন্তু এত তলাইয়া দেখিবার আর তাহার অবসর ছিল না—সে মনে মনে সুকুমারীর কার্য্যকারণের মূঢ়তার প্রতি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া গান ধরিল। মীনা তাহার কাছে গানটি তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পুনরাগত মায়ের হাত হইতে চায়ের কেটলিটা লইয়া কহিল, নিমুদার কোথায়, তিনি তো চা খান না—দাঁড়াও আমি নিযে আসছি—

একটি হরিণীর মতন লীলায়িত দেহে সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সুকুমারী নির্ম্মলের সুমুখের সোফায় বসিয়া আরম্ভ করিলেন, তোমরা সকলেই বেশ ছেলে। অজিতের নাকি বড় জমিদারী আছে। সে কি বিয়ে করবে না নিমু? তার মা কেমন লোক, দেখ, একবার ওঁর সঙ্গে আলাপ করে আসতে ইচ্ছে হয়। আচ্ছা বল তো নিমু, তুমি তার সব খবরই রাখো বলে জিজ্ঞেস করছি; অজিত কি বিলেত যাবে?

নির্ম্মল মহা ফাঁপরে পড়িল। অজিতের সম্বন্ধে অবশ্য সে সমস্তই জানিত, কিন্তু বিবাহ-সম্পর্কে অজিতের যে মত তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিলে, এই কন্যাসর্ব্বস্ব প্রৌঢ়ার যে মূর্চ্ছার উদ্গম না হইবে তাই বা কে জানে? অজিতের মায়ের সুখ্যাতি, তাহাদের বিরাট জমিদারীর আয়তন যে কলিকাতার বিশাল সৌধশ্রেণীর মধ্যে বাড়িয়া যাইতেছে তাহার বড় বিজ্ঞাপন দিয়া সে চুপ করিল। বিবাহের মতামত সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া যে সে রেহাই পাইবে তাহারও কোন কারণ না দেখাইয়া সুকুমারী পুনরায় প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বাধা পাইলেন মীনার আগমনে। মীনা গরম দুধের বাটিটা টেবিলের পরে রাখিয়া

বলিল, আজ বোধ হয় তারা কেউ আসবে না মা, নিমুদার খাবার ব্যবস্থা করে দাওগে, আমি ততক্ষণ গানটা শিখে নিই।

নির্ম্মল যেন হাতে আশমান পাইল। সুকুমারী উঠিয়া গেলেন। মীনা অর্গানের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, মায়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ী। যেন্না ধরে গেছে—মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো যে কত কি পাপ বেশ টের পাচ্ছি। নাও নিমুদা, দুধ খেয়ে আগে গানটা শিখিয়ে দাও!

নির্ম্মল দুধের বাটি হাতে লইয়া চুমুক দিয়া কহিল, এবার তুমি অর্গানে বসো, আমি গাই—তুমি বাজাবে, খুব সহজেই তুলে নিতে পারবে।

মীনা তাহার কথামত কাজ করিল। নির্ম্মল তাহার কাছে বসিয়া গানের কলি উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিল, যেখানে মীনা ভুল করিতেছিল সেখানে আঙ্গুল দিয়া চাবি টিপিয়া দেখানো তাহার কাজ। কিছুক্ষণ কসরৎ করিয়া মীনা জ্বলিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার গাল ফুলাইয়া আসন ত্যাগ করিয়া অদূরে সোফায় বসিয়া বলিল, ওঃ বড় পরিশ্রম, আমি একটু চা খেয়ে নিই।

কেট্‌লি হইতে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া সে মুখ লাগাইয়া ঠাণ্ডা বলিয়া ঠেলিয়া রাখিল। নির্ম্মলের যেন কোথায় বাজিল, সে তাহার সুমুখের টেবিলের কাছে বসিয়া বলিল, প্যারীকে বলে আর এক পেয়ালা চা আনিয়ে লও না!

না, আর দরকার নেই,—বলিয়া অকস্মাৎ মীনা মুখখানা গোল করিয়া পরিত্যক্ত বইটা টানিয়া পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে বলিল, আচ্ছা নিমুদা, তুমি কখনো ট্রেণে করে বহু দূরের পথে গিয়েছ?

নির্ম্মল একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া গেল। মীনা আজ যেন কোন কথারই কোন সূত্র রাখিয়া বলে না। সব বিষয়টাতেই একটু

এলোমেলো ভাব। সে অদ্যাবধি মীনাকে যতদিন দেখিয়াছে ততদিন একটি প্রশান্তচিত্ত, সংযতবাদী, যুবতীকে শ্রদ্ধা করিবার আমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু অদ্যকার শিথিল-স্বভাব, ঈষৎ চঞ্চল, ঈষৎ অন্যমনা সুকোমল হৃদয়ের ছোঁয়াচটি যেন একটি চির শ্যামলী বালিকার মূর্ত্তি তাহার প্রাণের আবেগ-বেদিতে অপূর্ব্ব গরীমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল। মীনার জীবনের এই দিকটা এতদিন তাহার কাছে অপরিচিত ছিল। মীনার এই দুর্ব্বলতায় যেন মীনাকে অন্য সমস্ত দিন হইতে সহস্র গুণ সুন্দরী, আকাঙ্ক্ষার মাধুরী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার ঈষৎ লজ্জিত, ক্লান্ত রাঙ্গা কপোলের অকলকে শিখাটি যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া বিস্তৃত ব্যবধান সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিল। সে আপনার হৃদয় ক্রমেই কম্পিত শিহরণে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে বুঝিয়া ভারী চক্ষু তুলিয়া মীনার দিকে চাহিবামাত্র মীনা পুনরায় আরম্ভ করিল,—আমরা যখন লক্ষ্ণৌয়ে থাকি তখন অনেক দেশ বেড়িয়েছি। এক সময় মুশৌরী যাবার পথে ট্রেণে বসে আমার পাশের কামরায় এক ভদ্রলোকের গান শুনলাম—মনে কী হচ্ছিল নিমুদা! সে সময় যদি তুমি থাকতে, তবে আরও মজা হ'ত। ও লোকের গান—অবশ্য তখন খুব ভাল লেগেছিল—ঐ নির্জ্জন, নির্ব্বান্ধব প্রান্তরের বুকে ট্রেণের মধ্যে সন্ধ্যার কাকজ্যোছনায় যে ভাল লাগে সকলেরই জানা আছে; কিন্তু এখন বুঝছি যে তোমার এই মিঠে গলার আওয়াজ বোধ হয় তখন ঘুম আনত। তুমি যাবে নিমুদা, চল, আর একবার আমরা সেই পথে বেড়িয়ে আসিগে কি বল?

নির্ম্মল যেন এতক্ষণ একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে হঠাৎ খোঁচা খাওয়ার মত ভাব দেখাইয়া বলিল, তা চলোই না—মন্দ কি।

মীনা সোফা হইতে উঠিয়া একেবারে নির্ম্মলের কাছে আসিয়া টেবিলের

উপর ঝুঁকিয়া বলিল, আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক কি বল, তার পূর্ব্বে একথা কাউকে বোলোনা—বলবে না ?

বলিয়াই সে নির্ম্মলকে কথা বলিবার ফাঁক না দিয়া বলিল, তুমি অমন মুখ গুঁজে বসে আছ কেন ? আমার সঙ্গে তুমি যাবে তো ?

মীনা তাহার মুখের দিকে এমন আগ্রহপূর্ণ তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিল, যে নির্ম্মলের আর ভাবিবার অবসর রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে চাহিয়া দেখিল, মীনা হাতের উপর মাথা রাখিয়া তাহার দিকে উত্তরের জন্যে চাহিয়া রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কেন যাবো না—তোমার পরীক্ষার পর নিশ্চয়ই যাব।

কিন্তু কাউকেই এই প্ল্যান ভাঙ্গবে না বলে দিচ্ছি, ঠিক তো?—বলিয়াই মীনা নির্ম্মলের হাতের ঘড়িটার উপর অন্যমনস্কের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নির্ম্মল আশ্বাস দিয়া বলিল, না কাউকেই বলব না মীনু !

বলিতে বলিতে মুখ তুলিয়া, পর্দ্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার মুখের সমস্ত রঙ্‌ বদলাইয়া ছাইয়ের মত শাদা হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া মীনা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অজিত ঘরে প্রবেশ করিতেছে। সে বিষয়টার কোন গুরুত্ব অনুভব করিল কিনা বুঝা গেল না। তৎক্ষণাৎ নির্ম্মলের দিকে ভ্রূকুটি ফেলিয়া কহিল, কিন্তু মনে থাকে যেন নিমুদা, প্রতিজ্ঞার কথা !

মীনা উঠিয়া পূর্ব্ব আসনে বসিয়া অজিতকে আহ্বান করিয়া বসাইল। কিন্তু এদিকে নির্ম্মলের র‍্যাপারের তলায় থাকিয়া মাঘ মাসের দারুণ শীতেও সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিল। যে অবস্থায় সে অজিতের কাছে ধরা পড়িল তাহার তীব্রতা যেন তাহাকে শূলের মত বিদ্ধ করিয়া আসনের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অজিত তাহাকে কোন কথা না বলিয়া সুকুমারীর সন্ধানে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এই রকম সময়টাতে মানুষের ন্যায় অন্যায় বিচার বিবেচনার সকল জ্ঞান লইয়াও মানুষ একরোখা হইবার জন্যে নিজেকে দৃঢ় করিয়া তুলে। অজিত তাহাদের দুজনকে যে কোন কথা বলিল না তাহাতে নির্ম্মলের আর কালবিলম্ব না করিয়া এ বাড়ী ত্যাগ করাও যেমন অশোভন, বসিয়া অজিতের অবাক তিরস্কারের প্রদাহটা সহ্য করাও তেমনি অসঙ্গত। কিন্তু সে কিছুই করিতে না পারিয়া মনের দুর্ব্বলতা ঝাঁটাইয়া দূর করিবার অভিনয় করিয়া মনে মনে বলিল, এতে আর দোষ কি, যদি সে সত্যি মীনাকে চায় তবে তার এই চাওয়ার পথের বিঘ্ন তাকে কাতর করবে কেন? এতো আর অন্যায় কিছু নয়? একদিন এই মীনা যে প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে ঘর করবে তখন কি কেউ কোন উচ্চ বাচ্য করতে সাহস পাবে? তবে এখুনি বা অজিতের ভয়ে মুষ্‌ড়ে পড়বে কেন?

কিন্তু তাহার মনের এই অবস্থায় কোন সিদ্ধান্তই সত্য সাহসের পতাকা তুলিয়া দাঁড়ায় না। অগত্যা একটা দ্বন্দ্বোময় অস্থির মন লইয়া সে কোন মতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া চলিয়া গেল—অজিতের সঙ্গে দুই একটা ছেঁদো কথা ছাড়া প্রাণকে ঢালিয়া দিতে পারিল না।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত দৃশ্যের পরিকল্পনাটা চট্ করিয়া অজিতের মনে না আসিলেও, সে যতটুক বুঝিয়াছিল তাহাতে নির্ম্মলের প্রতি একটা ঘৃণার খোঁচা নিক্ষেপ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সে তাহার আভাসের বিন্দুমাত্র প্রকাশের সুযোগ না দিয়া সটান সুকুমারীর কাছে গিয়া, সংসার সমাজের কথা লইয়া তর্ক বিতর্কে সুকুমারীকে সন্তুষ্ট করিয়া আসিল। মীনা তখনো ড্রইংরুমে বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া ছিল, অজিত তাহার সুমুখ দিয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বাড়ীর দেউড়ী পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িল। মাথার মধ্যে এতক্ষণ যে একটা প্রবহমান অগ্নিশিখা ফল্গুধারার মত অবগুণ্ঠিত ছিল ইহার প্রদাহটি যেন তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ট্রামে বসিয়া সে আপন মনের একান্ত নিজস্ব অস্বস্তিটার জ্বালা ঘাঁটিতে লাগিল। এত শীতের মধ্যেও যেন তাহার জ্বালার অন্ত নাই! সে এসপ্ল্যানেড টার্মিনাসে অবতরণ করিয়া আউটরাম ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। ইচ্ছা,—যদি বা বাহিরের নৈসর্গিক হিমেল বায়ুতে তাহার অস্বস্তি কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয়।

কেল্লার সানুদেশে গঙ্গার বুকের নিস্তব্ধতা বহিয়া একটানা কন্‌কনে বাতাস আসিয়া তাহার কাণের ভিতর বরফ ছিটাইয়া যাইতেছিল। আকাশের খণ্ডাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তারই মাঝে কয়েকটি ক্ষীণ তারা কি যেন বলাবলি করিয়া হাসিতেছে, দেখিয়া অজিত ইহার অর্থ বাহির করিতে বৃথা কালক্ষেপ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা জ্বালিয়া সে তাহার আচ্ছন্ন অন্তরের ক্ষুদ্র

বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠের বেদনাপর্য্যায়ের কঠোর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল।

বিষয় কিছুই না। অথচ সামান্য তুচ্ছ বিষয়, যাহা নাকি কোনদিন অজিতের চিরমূক হৃদয়ের পর্দ্দায় একটি ক্ষুণ্ণ আঁচড়ও ফেলিতে পারিবে না বলিয়া সে নিঃসন্দেহ ছিল, তাহারই একটা দিকে যেন পাতলা ব্লেডের মত তাহার মনটা অতি সঙ্গোপনে, অলক্ষ্যে চিরিয়া দিয়া গেছে। মীনার সহিত তাহার জীবনের যে কয়টা নিষ্কলঙ্ক মাস অতীত হইয়াছে, তাদের কোনখানে প্রচ্ছন্ন ঝোপের আবরণ ছিল বলিয়া তাহার জানা নাই। সে এতদিন যেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, শুধু সু-উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে প্রশস্ত পথ ছাড়া আর কিছুরই সন্ধান তাহাতে পায় নাই। তার আনন্দময় আকাশে সে শুধু মীনাকে একটি ডানামুক্ত বিহঙ্গম ছাড়া আর কিছুই ভাবে নাই। কিন্তু আজ যেন তাহার পাখার অন্তরালে একটি আত্মা সদ্যস্ফুট ডিম্বের আকারে, তাহার দুই চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া গেল। নির্ম্মলকে যে সে এমন করিয়া মীনার গতিচাঞ্চল্যের তরঙ্গে লীলায়িত দেখিবে এ অসহ্য জ্ঞানটা তাহার দুঃস্বপ্নেরও অতীত।

কয়েকটি সীমাবদ্ধ মিনিটের অধিক কাল সে ঘাটে বসিয়া থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে পুনরায় ট্রামের দিকে ফিরিয়া আসিল। ট্রামে বসিয়াও সে স্বস্তি পাইল না। মীনার সমক্ষে নির্ম্মলের নির্ব্যূঢ় অবস্থিতিটা কল্পনা করিয়া কেবলি মনের সর্ব্বাংশে বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। নির্ম্মলের কল্পনা করিবার সময় তাহার মনুষ্যত্বের আভিজাত্যটা তাহার সদ্বিবেচনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মলের প্রতি অপ্রতিহত বিশ্বাস, অনাবিল শ্রদ্ধা, তাহাদের দুই বন্ধুর সম্পর্কের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সেতু বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। কত

অসহ্য ঘটনার মধ্যে, তাহাদের দুটি প্রাণের নিরঙ্কুশ সৌহার্দ্দ্যের কুসুমটি, আলোড়িত নির্ঝরিণীর বুকে কুসুমাঞ্জলির মত চিরহাস্যোজ্জ্বল বেশে অসীমের সঙ্গমলালসায় নাচিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোনদিন ইতরবিশেষ ব্যতিক্রমের ছেদ পড়ে নাই। আজ যেন এই একান্ত স্নিগ্ধ বান্ধবত্বের মাধুর্য্যের স্রোতটিকে নীল হইয়া উঠিতে দেখিয়া অজিতের নাড়ী টন্ টন্ করিয়া ছিঁড়িতে চাহিল। কোন একটা সুমীমাংসার বিন্দুমাত্র আশা সুদূরপরাহত বুঝিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সুকিয়া ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ী। সুমুখে লোহার রেলিং প্রহরীর মত মাথা উঁচাইয়া রহিয়াছে। গেটের এক কোণে একটি ভোজপুরী দরোয়ান আসন ছাড়িয়া অজিতকে সেলাম জানাইল। অজিত তাহার দিকে চাহিয়া নীরব সহাস্য প্রত্যুত্তর দিয়া সটান তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কেন যে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহার কোন হদিস্ না পাইয়া সে ড্রেসিং টেবিলের ডালাটা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানা বই খুলিয়া বসিল। কিন্তু পড়িবে কে? তাহার মন তখনো উদ্দেশ্যহীন আচ্ছন্ন ভরপুর।

সংসারে সত্যপরিচয়ের বনিয়াদে দাঁড়াইয়া কে কতজনের সঙ্গে মিলামিশা করে! যাহাকে আজন্মকাল কোলের কাছে পাওয়া যায়, যাহার সুখদুঃখের হিসাব নিকাশ লইয়া মন যোগাইয়া চলিতে হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই আপনার মানুষ ভাবিতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচের তরঙ্গ উঠেনা! কিন্তু প্রতিপক্ষের গূঢ়তম স্বভাবের সত্য সত্বা যখন ভূইফোঁড় গুল্মের মতন মাথা চাড়া দিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার এই নিষ্করুণ সত্যরূপটি যে অপর পক্ষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার মাথা মুড়াইয়া অপরিচয়ের প্রাচীর গাঁথিয়া দেয়; এবং এই নির্দ্দয় প্রকাশ, যে,

কোন মান-হুস্-সম্পন্ন ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে না এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্রতি মানুষ—একে অপরের আসল প্রাণটিকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু যখন এই অব্যয় সত্যটি প্রখর ভানুর তেজে আবির্ভূত হয়, তখন কিন্তু একজন মুহূর্ত্তে অপরজনের আত্মীয়তার বেষ্টনী হইতে জ্যা-মুক্ত তীরের মতন দূরান্তে মিশিয়া যায়। নির্ম্মলও এ জ্ঞানটি জ্যোৎস্না রাত্রে প্রান্তরের বৃক্ষতরুর ন্যায় ঝাপ্সা আলো-অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইয়া চমকিত হইয়া উঠিল। এতদিন সে, যে মূর্ত্তিতে নির্ম্মলকে দেখিয়াছে সে মূর্ত্তি যেন অসম্পূর্ণ, তাহা যেন রঙরূপ অলঙ্কারবিহীন মাটীর ঢেলা, কিন্তু আজ যেন নির্ম্মল তাহার সকল সম্পূর্ণতা লইয়া অজিতের সুমুখে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপ করিয়া গেল।

অজিত উঠিয়া তাহার কক্ষের সমস্ত জানালা খুলিয়া পুনরায় বসিবার আয়োজন করিল। সিগারেট এতক্ষণ এ্যাশ্‌ট্রের পাথায় থাকিয়া নিভিয়া গিয়াছিল। ইহা পুনরায় জ্বালাইবার জন্য দিয়াশলাই হাতে লইল ; কিন্তু মায়ের আগমনে সে বাধা পাইয়া, মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছ ? আমি এখন খাবনা !

তাহার মা সুনন্দা দরোজার চৌকাঠ ছাড়াইয়া অজিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, তুই ভাবিস, তোকে বুঝি খাবার কথাই বলতে আসি,—

অবশিষ্টাংশের জন্য অজিত অপেক্ষা করিল না। সে দ্রুতকণ্ঠে বলিল, তা নয়তো কি, একটা মানুষ কত খেতে পারে ? রাতদিনই কেবল খেলে না, খেয়ে যা—কে চৌপর দিন খেতে পারে—আর তোমার এত সব নিয়ে থাকার দরকারটাই বা কি—বুড়ো হতে যাচ্ছ, কোথায় একটু চুপ মেরে বসে মালা টপ্‌কাবে, হরিনাম করবে, তা নয়, ছেলের খাওয়া কমে যাচ্ছে,

ঘুম কমে যাচ্ছে, কাহিল হয়ে পড়ছে! মা, তুমি কি মনে কর, আমি কি তোমার কোলের খোকাটি!

বালাই, ষাট,—এসব বলতে নাই, বলিয়া সুনন্দা অজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া পুনশ্চ আরম্ভ করিলেন, তোর আর এমন কি বয়েস হয়েছে, এখনও বিয়ে করিসনি; টুকটুকে বউ ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় না, তুই আর কি এমন বড় হয়েছিস খোকা, তোর বয়সে,—

কিন্তু সুনন্দাকে আর বলিতে না দিয়া, অজিত কয়েক হাত পশ্চাতে হটিয়া, আয়নার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, দেখ ফের যদি আমাকে খোকা বলে ডাকো তবে আর তোমার সুমুখে আসব না বলছি।

সুনন্দা পুত্রের চরিত্র জানিবেন না তো জানিবে কে? তিনি আস্তে আস্তে অজিতের কাছে আসিয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, জানিস, খোকা, চাঁদের জন্য যে মাষ্টারণী আসে, সে আজ ক'দিন ধরে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে যায়? ও তো আসে সন্ধ্যার আগে, তুইও সে সময় বাড়ী থাকিসনে; চাঁদকে পড়িয়ে শুনিয়ে রোজই একবার তোর ঘরে উঁকি মেরে যায়। কাল কিন্তু তুই বিকেলে বাড়ী হতে বেরোসনি, আমি বলেছি, তোকে বলে কয়ে রাখব।

কেন তুমি বললে? বিকেলে কেউ বাড়ী বসে থাকতে পারে? না, আমি পারব না, চাঁদকে ও পড়ায় তো আমার কাছে কি?

না না লক্ষ্মীটি, একটি দিন বৈতো নয়?—বলিয়া সুনন্দা পুনরায় পুত্রের মাথায় স্নিগ্ধ হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অজিত আর কোন আপত্তি করিল না দেখিয়া সুনন্দা অজিতকে এই ঠাণ্ডায় ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিবার জন্য অনুযোগ দিয়া কহিলেন, এই ঠাণ্ডায় যে অসুখ করবে খোকা! জানালাগুলি বন্ধ করে দিই।

বলিয়া তিনি অজিতের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিতে গেলেন। অজিত পুনরায় তাহার টেবিলের কাছে বসিয়া, বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইয়া, বাহিরের জামা কাপড় ছাড়িবার জন্য, উঠিয়া জানালার কাছে গেল। সুনন্দা ততক্ষণে জানালা বন্ধ করিয়া, পুনরায় অজিতের কাছে আসিয়া বলিলেন, দেখ খোকা, আজ কয়েক্‌দিন ধরেই দেবু আসছেনা কেন জানিস? সেদিন ওর সঙ্গে চাঁদের বিয়ে দেব বলেছিলাম, আমার মনে হয়, ওতেই সে লজ্জা পেয়ে আর আসে না,—ছেলেটি বড় ভাল,—নয়?

অজিত আশ্চর্য্যচক্ষে ভ্রু কপালে তুলিয়া বলিল, চাঁদের বিয়ে এখুনি দেবে মানে? চাঁদের তো মোটে পনের বছর বয়স,—এ বয়সেই তাকে জবাই না করলে, বুঝি স্বর্গ হতে মাসিমা, তোমায় অভিশাপ দেবেন! এ বয়সে তো আমরা বিয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আমার যদি চব্বিশ বছরে বিয়ে না হতে পারে, তো চাঁদের কেন হবে মা? তোমরা মেয়েগুলোর শ্রাদ্ধ না করে ছাড়বে না দেখছি!

সুনন্দা ইতিমধ্যে চাকরকে ডাকিয়া অজিতের খাবার দিবার আদেশ দিলেন। তারপরে বলিলেন, তুই তো এসব জানিস্‌নে খোকা, আমি আর চাঁদের মা পূর্ণশশী, দুজনের ছেলেবেলা থেকেই বড় মাখামাখি ছিল। শশী আমার সৎমায়ের পেটের বোন হলেও এ সম্বন্ধটা আমাদের মেলামেশার জোরে মুছে ফেলেছিলাম। বাবার আবার দুজনের প্রতিই সমান স্নেহ ছিল। তিনি আমাদের সুমুখে সকলের কাছেই বলে সুখ পেতেন যে, সুনু আর পুনুর বিয়ে বেশ বড় ঘরে না হলে দেবেন না। কিন্তু মেয়েমানুষের কপাল সম্বন্ধে নাকি বিধাতাও কোন মত লিখে যান নি। তাই বা

হবে,—না হলে পুন্নুর বিয়ে কোন মতেই হয় না যে? আমার বিয়ের দু'বছর পরেও যখন বড় ঘর মিল্‌ল না তখন বাবা কি করেন,—ওরও বা দোষ দেব কি; ষোল বছরের মেয়ে নিয়ে ওঁর না হয় ঘুম—না হয় খাওয়া। শেষ কালে এক বুড়ো বর দেখে এই কোলকাতায় বাগবাজারে বিয়ে দিলেন। তোমার মেসোবাবু তখন ত্রিশটাকা পেন্সন নিয়ে, একখানি ছোট বাড়ী নিয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপরে যা হ'ল এসব আর বলে লাভ নেই, খোকা, তবে একটা দুঃখু রয়ে গেল। আমার এখানে এসে, অসুখের সময় থাক্‌লেও বা ওষুধ পথ্য পেত। কিন্তু যা হবার নয় তার প্রতীকার কেউ করে নি। তাই বুঝি পুন্নুও এই চাঁদকে আমার কাছে আসবার কথা বলে, ভবযন্ত্রণা হতে বেঁচে গেল। এই চাঁদের জন্য পুন্নু কি না করেছে,—কুন্‌কের মাপে চাল ভিক্ষে করে এনে পাড়াপড়শীর কাছে অপমানিত হয়েছে,—সে প্রায়ই আমাকে বলে পাঠাত, সে মরে গেলে যেন চাঁদের ভার নিই! তাই তো বলি, বিয়ে জিনিষটা এত সহজ নয় যে, তুই যা মনে করবি তাই হবে। করতে না চাইলেও অনেককে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌তে হয়েছে, আবার অনেকে বিয়ের জন্যে হন্যে হয়ে বেড়ায়। তা যাক, তুই এক কাজ কর, কাল একটিবার দেবুদের বাড়ী যা, নেমতন্ন করে আয়,—নিমুকেও বলিস; তোরা তিন বন্ধুতে একসঙ্গে কাল এখানে খাওয়া দাওয়া করবি, সন্ধ্যের আগেই যেন ওরা আসে। তোরও তো কাল সন্ধ্যেয় বাড়ী থাকতে হবে!

অজিত এতক্ষণ চাঁদের জীবনের অন্তস্তলের দুঃখের ছবিটি কল্পনা করিয়া, বিষাদে মুখখানি ঘন করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে একটা ভাবান্তর আসিয়া তাহাকে বিশুষ্কপ্রায় করিয়া দিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে খাবার ঘরে গিয়া আহার শেষ করিল, আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া

তাহার মনে হইল,—দেবব্রতকে না হয় ধরিয়া আনা যাইবে; কিন্তু নির্ম্মলকে সে কোন লজ্জায় ডাকিতে যাইবে ?

গুমরোমুখে কৃষ্ণছায়া পড়িয়া অজিতের মস্তিষ্কের চিন্তা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সুনন্দা তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ভাবনার কি হ'ল রে খোকা, আয় খেয়ে যা!

সুনন্দাকে উঠিতে দেখিয়া, অজিত তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া কহিল, না কিছু না মা, যাই খেয়ে আসি গে, বড় ক্ষিধে পেয়েছিল; তাই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। কাল সকালে বেরিয়ে ওদের নেমত্যন্ন করে আসব, কাল আমাকে একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে তুলে দিও!

সম্মতিসূচক নীরবতা লইয়া, সুনন্দা সিঁড়ির পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অজিত আহারান্তে আপন ঘরখানিতে আসিয়া বিছানায় গড়াইতে লাগিল। ঘুম আসিতে যেটুকু কাল ব্যয়িত হইয়াছিল, তার মধ্যে সে নিজেকে সেন্সিটিভ্ ঠাওরাইযা মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সামান্য একটা অতি তুচ্ছ ঘটনায়, সে যদি এমন একতরফা বিষণ্ণ না হইত, তবে কি তাহারও নির্ম্মলের সহযোগিতাপূর্ণ সারল্যের মণিকক্ষের সুমুখে এমন একটা সুকঠিন রূঢ় উত্তুঙ্গ অনুতাপের প্রাচীর দুর্ভেদ্য আকারে দেখা দিতে পারে? নির্ম্মলের প্রতি আকস্মিক অবিশ্বাসের সমস্ত যুক্তি তর্ক যেন আপনা-আপনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আনিল। সে এতক্ষণে সত্য সত্যই বুঝিল যে, সে নিজে অত্যন্ত সেন্সিটিভ্!

বস্তুতঃ এ প্রকার নব অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপলব্ধিটুকু তাহার কেন, কোন মানুষেরই জটিল পথ ভবিষ্যতের ধাপে ধাপে নিরঙ্কুশ করিয়া আনে কিনা সন্দেহ। তথাপি সাময়িক একটা সান্ত্বনার স্নেহচ্ছায়া যে, প্রত্যেকেরই গ্লানিভরা অন্তরলোকে স্নিগ্ধ আনন্দোজ্জ্বল জ্যোতি বিস্রস্ত করিয়া যায়,

একথা সকলেই উৎফুল্ল অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর ব্যক্ত করিতে পারে। সে সময়ে নিজেকে আস্ত আহম্মুখ, আস্ত গাঁধা, উল্লুক নিছক বোকা বানাইয়াও কেহ অহঙ্কারের উন্নত মস্তকে ঘা দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অজিতও জীবনে কখনো বোধ হয় নিজেকে এত হালকা দেখিতে পারে নাই,—কিন্তু আজ যেন সে মীনার সরলতাটাকে সহস্রদিক হইতে রক্ষা করিবার জন্যে নিজেকে দুর্ব্বলচেতা মনে করিতে এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা বোধ করিল না। নির্ম্মলের মনের মধ্যে যে কোন কূট থাকিতে পারে তাহা তো বিশ্বাস করিতে চাহিল না,—এ যেমন অতি সত্য কথা, আবার যদি কোন নিভৃত অনুচ্ছেদে নির্ম্মলের মনে কোনও প্রকারের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা একান্ত বিরলে বাস করে, তবে ইহাকেও যেন, সে তাহার আপনার চিত্তের কাল-কূটের অন্যায় বিসর্পনের আবরণ মনে করিয়া নিজেকে ধিক্কৃত লাঞ্ছিত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ মানিল না। সে এই অবসাদের আনন্দে তবুও রাত্রের সুখশয্যা নিষ্কণ্টক করিবার জন্য লালায়িত হইয়া, নিজেকে সেন্সিটিভ্ ভাবিয়া ঘুমাইবার অবসর পাইল।

ভোর বেলার দিকে বাড়ীর তখনো কেহ জাগে নাই। সে খট্ করিয়া দরোজার ছিট্‌কিনির আওয়াজে, চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া চাহিয়াই চাঁদকে অতি সন্তর্পণে ঘরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, চক্ষু বুজিয়া জাগিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

চাঁদ একেবারে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিয়া বলিল, দাদা কি ঘুমোচ্ছ নাকি? মা যে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। তুমি সকালে উঠবে বলেছ?

বলিয়া সে অজিতের মুখ হইতে লেপটা সরাইয়া দেখিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, ওঠনা দাদা, তুমি যে কোথায় যাবে?

অজিত চক্ষু মেলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে মুখ ফুলাইয়া কহিল, দেখবি চাঁদী পোড়ারমুখী, আজ যদি আমার দিন ভাল না যায় তো—তোর মুখ দেখে কিন্তু উঠলাম।

অজিত উঠিয়া বসিয়া তাহার কণ্ঠগাম্ভীর্য্য চাপিয়া রাখা অসম্ভব মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিল। চাঁদ মাথার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল। বাহিরে পত্র-পল্লবে আচ্ছাদিত বাগানের সর্ব্বাঙ্গে ধব্‌ধবে শাদা কুয়াসা একটি শুচিশুভ্র বস্ত্রের মত বিছানো ছিল। চাঁদ কিছুক্ষণ বাহিরের কুয়াসার সঞ্চরণ দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। অজিতের বিছানার সম্মুখে কুশন চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে দাদা?

যেখানেই যাই তোর তাতে কি?—বলিয়া অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের আদেশ যেই হল, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে। বলনা,—বলিতে বলিতে চাঁদ উঠিয়া অজিতের সুমুখে আসিয়া হাস্যস্ফূরিত অধরে ক্ষীণ বক্র-ভঙ্গী করিয়া কহিল, মাইরি বলছি, দাদা, আজ তোমার দিন ভাল যাবে, মীনাদি' আজ তোমাকে অনেকখানি আদর দেখাবে'খন।

অজিত ঘরের মধ্যে পায়চারী সুরু করিয়া বলিল, ওর আদরের জন্য আমার ঘুম হয় না কিনা! সকালবেলা উঠে ওদের নাম করিস্‌নি, চাঁদ দেখবি আজ তোরও দিন ভাল যাবেনা। জানিস্‌ আজ কোথায় যাব?

একটু বিদ্যুতের মত হাসিতে অজিতের অন্তরের ব্যঙ্গভরা একটি ভাব সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে প্রতিভাত হইল। চাঁদ ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অধর দংশন করিয়া বলিল, যাওনা তুমি, যেখানে ইচ্ছা, তাতে আমার কি আসে যায়?

অজিত কথাটার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, তা বলে দেবুর বাড়ী যাচ্ছিনে।

যাও! তোমার সব তাতে বাড়াবাড়ি। এই আমি চল্লাম। বলিয়া চাঁদ বাহিরের দিকে যাইতেছিল কিন্তু অজিত তাহার পথ আগলাইয়া বলিল, দাঁড়া এক সঙ্গেই চা খাব'খন।

কথা বলিতে বলিতে দু'জনে দুইদিকে বারান্দা ঘুরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৬

মাটী চাপা পড়িলেই যেমন বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়, পত্রে পুষ্পে মুকুলে আনন্দমূর্ত্তি ধারণ করে, নীলাঞ্জন তাহাদের স্নিগ্ধ আচ্ছাদন স্বরূপ জাগিয়া থাকে, দিগম্বর নভোতল নানা রঙে রূপে তাহাদের সুকোমল তনু অনুরঞ্জিত করে ; তেমনি রাত্রির সুশান্ত, নিবিড় সুখাবরণমুক্ত অজিতের হালকা প্রাণটি যেন নূতন করিয়া ধরিত্রীর আনন্দপ্লাবনে নিরবসন্ন আবেশ কুড়াইয়া নবজীবন লাভ করিল। সমস্ত অমা-ঘন রাত্রির দুশ্চিন্তা যেন শরতের লঘু মেঘের মত বায়ুভরে উড়িয়া গেল,—তাহার অন্তর ভরিয়া কাঞ্চনাভ রৌদ্র-কিরণের স্থির প্রশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

সকাল বেলা চাঁদের সঙ্গে চা খাইয়া জামা গায়ে সে নিমন্ত্রণের ভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। ওয়েলারবাহিত প্রকাণ্ড জুড়ীখানা চড়িয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে অনেকদিনের অনেক চিত্তরঞ্জক কল্পনা আসিয়া তাহাকে উদ্বেলিত করিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে পড়ে—সেদিন ঘন শ্রাবণের অবিরল ধারায় সমগ্র কলিকাতা সহর ডুবিয়া গিয়াছিল। সে মীনাকে কলেজ হইতে বাড়ী পৌছাইবার মানসে এ জুড়ীখানাতে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিল। এমন সময় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের বক্ষ ফাটিয়া আকাশটা একটা হাহাকার করিয়াছিল মাত্র ; তার পরেই প্রচণ্ড বর্ষণে পাকা পথের যানবাহন লোক চলাচল বন্ধ। সে মীনাকে লইয়া মোটে ওয়েলেস্‌লী স্কোয়ার ঘেঁষিয়া আসিয়াছিল,—ঝড়ের জলে কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইতে সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছিল। গাড়ী একটা বাড়ীর নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। বাধ্য হইয়া গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া টর্চ্চটা জ্বালাইয়া

অজিত ও মীনা অপেক্ষা করিতেছিল। অজিতের মনে হইল, মীনা তাহার একান্ত পার্শ্বেই ভীত মৃগশিশুর মত করুণার্দ্র-চোখে, তাহার দিকে এমন অসহায় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল যে, তাহার সেই চাহনির তীক্ষ্ণ তরঙ্গটা যেন আজ আবার তাহার চিত্তে সেদিনের সমস্ত উন্মাদনা লইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেদিন সে নিজে ঐ দৃষ্টির মাধুর্য্যের উত্তাপে গলিয়া গিয়াছিল। সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়াছিল, মীনা, আজ যেন আর কোন নীতিকেই মানতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয় মানুষের বাঁচবার যেমন কোন নিশ্চয়তা নেই তার স্বচ্ছন্দজীবনের দ্রুত পদক্ষেপের মধ্যে কোন সংশয়ও থাকা উচিত নয়।

মীনা বলিয়াছিল, মানুষের স্বাধীন প্রেরণার মূলে কুঠারাঘাত করতে অবশ্য কোন নীতিকেই ডেকে আনা উচিত নয়; কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়, অজিতদা, নীতি আর সংশয় এক বস্তু নয়। নীতি অবশ্য অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনের অধীন, তাই নীতিকে অনেক সময় মূল ছাড়া নক্ষত্রের মত মনে হয়; কিন্তু খুব চিন্তা করে তলিয়ে দেখলে বুঝা যায়,—নক্ষত্রেরও একটা মূল আছে একটা আশ্রয় আছে। সেটাকেই মানুষে কর্ত্তব্য বলে, তার আদেশ পালন করে সকলেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। নীতি না মানলেও কর্ত্তব্য মানতে হয়ই আর সেই কর্ত্তব্য, যার যার ধাত অনুযায়ী ধরা পড়ে।

অজিত উদাস দৃষ্টিতে মীনার বইগুলির দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়াছিল, কর্ত্তব্য মানতে হ'লে অনেক কিছুর অধীনে ধরা দিতে হয় তা' জানো?

জানি। কিন্তু এ কথাটাও জেনো অজিত দা, একটি কর্ত্তব্য সব মানুষের সাধ্য নয়। এক জনের কাছে যে বাঁধনটা সোনা হয়ে ওঠে,

অপর জনের কাছে তা' হয়তো বা ফাঁস লাগিয়ে যম-যন্ত্রণার অভিনয় করে। তেমনি কর্ত্তব্যও সকলের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয় না। একই আগুনে ঘরের অন্ধকার দূর করা যায়, আবার সেই আগুনেই ঘরখানিকে ভস্মসাৎ করিয়ে দিয়ে যায় এক মুহূর্ত্তে,—কর্ত্তব্যও ঠিক এই সংযমের বশবর্ত্তী। কারণ, সমগ্র সংসারটা এক নিয়মেই চলে কি না!

একই নিয়মে চলে, একটি মাত্র লক্ষ্যই সকলের কাম্য, তবু মনে হয়,—গ্রাস যখন মুখে তুলতেই হবে, তখন সোজাসুজি তোলাই সঙ্গত।

কিন্তু এও যেমন সত্য ধারণা, আবার এর উল্টা পিঠটাও না দেখলে চলবে না, অজিতদা! তুমি কি এমন কোন একটা আইন করে দিতে পারো যা' সকলেবই পক্ষে সমান কার্য্যকরী হবে? যত মত তত পথ। মানুষেব আপন রুচি অনুসারে যে পথ নেবে, তার শেষ দেখতে হলে তাকে একটা কর্ত্তব্য মানতে হবে। ওখানে দুর্ব্বলতা এলে, স্বভাবের শাসন আলগা হয়েছে বুঝতে হবে।

মীনার কথাগুলি অজিতের কাছে নতুন নহে। কেননা, তাহার কথাই মীনার দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছিল। কোন একটা আদর্শ, সহজাতরূপে আবির্ভূত হইলে তাহার পরিপূর্ণ ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যচ্যুতির আশঙ্কা থাকে,—একথা সে মীনার কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতন বলিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু আজ যেন তাহার স্ব-বচিত জালে গুটি পোকার ন্যায় নিশ্চিন্ত হইতে গেলে বিরাট কিছু হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই কল্পনা ও ভয়ের উত্তেজনায় তাহার বুকের ভিতরটা ভূমিকম্প-ক্ষুব্ধ ধরিত্রীর মতন কাঁপিয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির প্রবল ঝাপ্টা বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। অজিতের গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। সে টর্চ্চটা নিস্তেজ করিয়া, দরোজা কিঞ্চিৎ

ফাঁক করিতেই ভিজা বাতাসের দমকা ছাট আসিয়া তাহাদের পায়ের দিকে লুটাইয়া পড়িল। অজিত পুনরায় দরোজা ঘনিষ্ঠ করিয়া, টর্চ্চটা জ্বালিয়া, মীনার দিকে রুক্ষ অপরিচিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—কিন্তু কোন কর্ত্তব্যই আমাকে পাকাপাকিভাবে চেপে রাখতে পারবে না মীনা, কাল হয়তো যে ফুলে পূজো আমি করেছি, আজ তা ম্লান হ'লেও তা' দিয়েই পূজো করতে হবে এমন কোন কথা শাস্ত্রেও লেখে নাই। তুমি যা'ই কেন বলনা, আমার প্রাণ যখন হুহু করে উঠতে চায়, তখনো আমি নিশ্চেষ্ট থাকব,—এমন শাস্তি কি আমার প্রাপ্য ?

বলিতে বলিতে অজিতের দুই চক্ষু হিংস্র পশুর ন্যায় আগুনের গোলা হইয়া উঠিল। মীনা তাহার প্রভাবে নিজেকে অত্যন্ত অসহায়, একা মনে করিতে বাধ্য হইল। সে অবিলম্বে অজিতের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া সুমুখের আসনে বইগুলির উপরেই বসিয়া বলিল, তুমি কি বলতে চাচ্ছ, অজিতদা, খুলে বল। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে! তুমি আজ এত এলোমেলো বক্‌ছ কেন ?

অজিতের দৃষ্টি অভিমানে আহত, ঘন হইয়া উঠিল। সে মীনার চকিত চোখের দিকে নিবদ্ধচক্ষে চাহিয়া বলিল, তুমি তা' বোঝনা, মীনা! আমার সোনার শেকল আজ আমি নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলতে চাই। তোমার দিকে যত দেখি, ততই যেন আমার প্রাণ হাহাকার করে ওঠে, মনে হয় মিথ্যার ধুনি জ্বেলে শব-সাধনায় মেতে মনকে চোখ ঠেরে যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে আর চলে না। আমি চাই তোমাকে। চাই তোমাকে আমার প্রতিদিনের সাথী করে, প্রতি রাত্রির সহচরী করে, আনন্দের সহযোগী, দুঃখের সমভাগী, আশা-নিরাশায় শক্তিময়ী প্রেরণা-রূপে; তার জন্যে যদি তোমাকে বিয়ে করতে হয়, তবে তা'তেও আমার

ঝাঁপ দিতে হবে, কোন সংস্কারই আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

অজিত এক আপ্লুত দৃষ্টিতে মীনার দিকে চাহিয়া কথাটা শেষ করিল। কিন্তু তাহার রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের নিঃসহায় মত্ততা মীনার বাক্‌শক্তি রহিত করিয়া দিয়াছিল। বিহ্বল অভিভূতের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মীনা বলিল,—একথাটা দুর্ব্বলতা ছাড়া কিছুই নয় অজিতদা, শুধু একটা অবসাদের মায়া তোমাকে এইরূপ শিথিল করে দিচ্ছে। বিয়ে করা অবশ্য সব ক্ষেত্রে খারাপ নয় কিন্তু নিছক লালসার বশবর্ত্তী হয়ে করাতে যে নীচতা প্রকাশ পায় তার দায়ী তোমাকে হতে হবে!

লালসার কি কোন মূল্য নেই বলতে চাও মীনা? তবে সংসার চলে কিসের জোরে, কোন রূপে? তুমি কি তোমার অগ্নিময়ী ক্ষুধা চেপে কোন একটা মরিচীকার পশ্চাতে আর্ত্তের মত ছুটতে পারবে, কেউ কি তা পারে?

যারা পারে না তাদের কাছে সংসার অতি ক্ষুদ্র, মানুষ অতি জঘন্য। শুধু যারা বাইরের প্রতিমা পূজা করেই জীবনের চরম সার্থকতা পেতে চায় তারাই কেবল লালসার মূলধন নিয়ে কারবার করে। কিন্তু বাইরে যে অগ্নি মুখ বার করে, তার পিছনে একটা জ্যোতির্ম্ময় চিরসুন্দর অন্তহীন প্রতিভা রয়েছে, যার আস্বাদন পেলে আর বাইরের অবসন্নতার লোভ বড় হয়ে উঠতে পারে না। এ কারণেই লোকোত্তর প্রেম কাম্য, এ কারণেই অল্পে সুখ নেই, সন্তুষ্ট হতে নেই। আর আমার মনে হয় অজিতদা, তুমিও এতদিন এমনি একটা বড় কিছুর স্বপ্ন দেখে আসছ, আর আজ আমিও তোমাকে বলছি, সংসারের ছোটখাট তুচ্ছ বিষয়ের লিপ্সায় তোমার উদার আদর্শ ভুলে যেও না—এটাই তোমার নীতি আর ইহা

পালন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি শক্ত হও অজিতদা, সংসারে আর কেউ তোমাকে অনুসরণ না করুক—আমি এ পথ ছাড়ব না—আমি চিরকালই তোমার সাথী হয়ে এই পথে অগ্রসর হব।

এই কথা বলিয়া মীনা তাহার বাড়ীতে নামিয়া গিয়াছিল। অজিতের মন বারে বারে মীনাকে সম্ভ্রম জানাইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিল।

এই কল্পনাটি আজ আবার তাহার মনের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া দিয়া গেল। এক মূহূর্ত্তে গত কল্যকার ব্যতিক্রমটা কল্যাণের ইঙ্গিত হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয় মীনার প্রতি সহানুভূতির আনন্দে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। সে বুঝিল যে, ব্যতিক্রম নিয়মকে সুষ্ঠু করিয়া তোলে।

এই প্রকার আপ্লুতচিত্তে অজিত, নির্ম্মলের মেস, দেবব্রতের বৌবাজারের বাড়ী আমন্ত্রণ কার্য্য শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্রে কলিকাতা সহর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

অপরাহ্নের দিকে অজিত, একটু ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাহার অভ্যাগত বন্ধুবর্গের আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করিয়া আপন পাঠগৃহে উর্দ্ধকর্ণ হইয়া বসিয়াছিল। একটা চুরুট শেষ করিয়া সে আরাম কেদারায় বসিয়া র‍্যাফেলের একটি মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিল। সাধক শিল্পীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে কেমন শান্ত সৌন্দর্য্যে বাস্তবের গায়ে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে, তাহার চিন্তায় সে মগ্ন সমাহিত ছিল। এমন সময় তাহার ঘরে জুতার শব্দ শুনিয়া, উচ্চকিত চক্ষে সে দরোজার দিকে তাকাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

চাঁদের সঙ্গে একটি বাইশ তেইশ বছরের মহিলা তাহার ঘরে ঢুকিল। একেবারে তাহার কাছে আসিয়া, সে অজিতকে নমস্কার করিয়া, অদূরে

লম্বা কোচের মধ্যে ডুবিয়া পরিচয় প্রসঙ্গে বলিল, আমি একটা স্কুলের হেড্ মিষ্ট্রেস্ বটে, তা হলেও আমার এ্যাম্‌বিশন অনেক মহৎ। এমন কোন সুযোগ পাচ্ছি না, যে আমি একটু সাহায্য নিয়ে বি, এ,টা পাশ করি। চাঁদের কাছে রোজ আসি, যখনই আসি তখনই দেখি আপনি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আলাপ করার অদম্য কৌতূহল থাকলেও সুযোগ মেলে না। তাই কাল মাকে বলে রেখেছিলেম। আমার বড় সৌভাগ্য, যে আজ আপনাকে পেলুম।

কথা বলিতে বলিতে মহিলাটি এতক্ষণ তাহার হাতের ব্যাগটি হইতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাহির করিতেছিল। ইহা অজিতের হাতে দিয়া কহিল, আমার নাম, কুমারী মঞ্জুলা রায়, বোধ হয় চাঁদের মুখে শুনে থাক্‌বেন।

অজিত এতক্ষণ একটা কথাও বলে নাই, কেবল প্রতিনমস্কার করিয়া নীরব হইয়াছিল। সে চাঁদকে নিকটে ডাকিয়া বলিল, দে তো আমার জামায় এই কার্ডখানা রেখে, দেখি যদি নিমুকে দিয়ে ওঁর পড়ানোর ব্যবস্থাটা করতে পারি। আমার তো মোটেই সময় কম, তা দেখুন, আমার একটি বন্ধু আছেন, নির্ম্মল রায়। ওঁকে বললে হয়তো একটা ব্যবস্থা হতেও পারে। আচ্ছা আপনি কিছু দিতে পারেন? সে অত্যন্ত গরীব লোক, টিউশানি করে খায়।

অজিত মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া কথাগুলি শেষ করিল। মঞ্জুলা যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। সে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া, একবার ঝাড় লণ্ঠনের কাঁচগুলির দিকে চাহিল। তার পরে সোনার কাঁটায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ঘোমটা ললাটের দিকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, আর কারো কাছে পড়বার আমার প্রবৃত্তি নেই। যার তার কাছে

শিখতে হবে বলেই আজ তিন বছরের মধ্যে আর চেষ্টা করি নাই। যেদিন থেকে আপনার মা আমায় নিযুক্ত কর্‌লেন, সেদিন থেকেই কেবল মনে হল, এতদিনে বোধ হয় আমার মনস্কামনা অপূর্ণ থাকবে না। অজিত বাবু, কোন পরিশ্রমের কাজ হবে না। আমি নিজেই অনেকটা পড়া শোনা করে তৈরি কর্চ্ছি—তবু একজনের সাহায্য না পেলে কেমন বিশ্বাস হয় না। আমার এই একটা অনুরোধ। অজিতবাবু, তার জন্যে কি আপনার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে যেতে হবে?

অজিত বুঝিল, মঞ্জুলা তাহাকে ছাড়িবে না। সে খানিকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া হাঁ না করিয়া পরিশেষে সম্মতি দিয়া কহিল, দেখুন, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, আপনি তা পাবেন। তবে সময়ের একটু আধটু অনাচার হতেও পারে। আমার এখানেই পড়বেন তো?

সেটা আপনার সুবিধামত, বলিয়া মঞ্জুলা কোচ ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। অজিতও উঠিয়া বলিল, এখানেই ভাল হবে, কি বলেন!

হ্যাঁ তাই হবে। কিন্তু আমার দিকে একটু দেখতে হবে অজিত বাবু, আপনি যে মনভোলা মানুষ,—আপনার মা এই নিয়ে রোজ আমার কাছে দুঃখু করেন। এখন তো আর ছেলেমানুষ নন, এখন একটু গম্ভীরভাবে সংসারের দিকে মন দিতে হবে বৈকি। আচ্ছা নমস্কার!

ঝক্‌ঝকে শাড়ীখানা বিদ্যুতের মতন কাঁপাইয়া মঞ্জুলা মস্‌মস্‌ করিয়া চাঁদের সঙ্গে চলিয়া গেল। অজিতের মনে কিন্তু মঞ্জুলার কথার শেষাংশগুলি তেমন মধুস্রাবী হইল না। নূতন পরিচয়ের লজ্জা ও সঙ্কোচ, মঞ্জুলা যেরূপ অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতেই এই মহিলার উপর তাহার শ্রদ্ধা তেমন উচ্চাঙ্গের হয় নাই।

ক্ষণপরে চাঁদ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পশ্চিমের খোলা বাতায়নপথে

কয়েকটি ঈষৎ রাঙা আলোরেখা আসিয়া অজিতের সুমুখে মেঝের পরে খেলায় মত্ত ছিল। একটু শীত শীত ভাব। অজিত আলনা হইতে র‍্যাপারটা তুলিয়া জড়াইয়া জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিল। চাঁদ ঘরে ঢুকিয়া অজিতের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চেয়ারের পিঠে হাত রাখিয়া বলিল, দাদা, মাষ্টার খুব আপ টুডেট্, কথাবার্ত্তা খুব সুন্দর, না? পড়ানও ভাল।

অজিত একটু আগেই মঞ্জুলার আচরণের অতিরিক্ত অস্বাভাবিকতার উপর চটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু চাঁদের কাছে এ গূঢ় উপধারণাটা প্রকাশ করাও সে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। শুধু প্রসঙ্গটা লাইনচ্যুত করিবার মানসে বলিল, তা তো হবেই। মাষ্টারী করে খেতে হয় কিনা, তাই কথাবার্ত্তায় কেতাদোরস্ত হতে হয়। তা হোক, তুই এখন চায়ের ব্যবস্থা দেখ দিকি, আমার তো ভেতর পর্য্যন্ত শীতল বরফ হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, দাঁড়াও, বলিয়া চাঁদ হরিণ শিশুটির মতন দৌড়িয়া ঘর হইতে বহির্গত হইল। অজিত উঠিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া ঘরের মাঝখানে গোল টেবিলের কাছে গিয়া বসিল। চায়ের কেট্‌লি ও পেয়ালা হাতে চাঁদ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সে হাঁকিয়া বলিল, মনে আছে তো চাঁদী, দেবু আজ রাত্রে এখানে খেতে আসবে। সকাল বেলা গেলুম, নেমত্যন্ন করতে। সে বলে কিনা, চাঁদ যদি সুমুখে না থাকে, তবে নেমত্যন্ন খাব না।—বলিতে বলিতে অজিত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, দে চা দে, অত আর লজ্জা দেখাতে হবে না।

চাঁদ চা ঢালিয়া দিতে গিয়া কেট্‌লিটা ধপ করিয়া রাখিয়া বলিল, আমি পারব না চা দিতে, না আমি কিছু শুনতে চাইনে। তুমি সব সময় আমাকে ঠাট্টা কর—যাই আমি এক্ষুণি গিয়ে মাসিমাকে বলে আসিগে।

আ মর পোড়ারমুখী, দে চা দে, আর বলব না বল্‌ছি।—বলিয়া অজিত চায়ের পেয়ালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিল।

চাঁদ তাহার অভিমানে স্ফীত পাণ্ডুর মুখখানি হাঁড়িপানা করিয়া চা ঢালিয়া দিল। অজিত চা মুখে লাগাইয়া আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল, কার এত দায় পড়েছে দেবুকে ডেকে আনবার জন্যে। আমার কিনা গরজ বড় বালাই! সকালে তার বাড়ী গেলুম, তার মা বলেন কিনা, দেবু তো আজ ক'দিন ধরে তার পিসিমার বাড়ী চন্দননগরে। যদি একান্তই দরকার মনে কর সেখান থেকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিও। এত কাণ্ড করে দেবুকে আনতে যাওয়ার তো গরজ আমারই কিনা! খেয়ে দেয়ে তো আর কাজ নেই আমার! বয়ে গেছে, তাতে কি—তোরই কাজ তোর সঙ্গে আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে, তোর জন্যে ও হাওড়া পুলের কাছ থেকে কত কি এনে দেয়—তোদের দু'জনের এত ভাব এত বনিবনাও তো আমার কি এল গেল!

এক চুমুক চা মুখে লইয়া অজিত আর কথা বলিতে পারিল না। এদিকে চাঁদের সমস্ত মুখ ঘামিয়া বেগুনের মত রঙ্গ ধরিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরের সুইচটা টিপিয়া চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হইল—একটা কথা বলিবারও প্রয়োজন মনে করিল না। কিন্তু অকস্মাৎ অজিতের স্বকৃত রূঢ় আচরণের জন্যে সে নিজেকে এমন বিপন্ন মনে করিল, যে তাহার দৃষ্টিতে ঘোর লাগিয়া গেল, মুখের চা পানের অযোগ্য বিস্বাদে ভরিয়া উঠিল। কোন মতে চায়ের পেয়ালাটা শূন্য করিয়া সে উঠিয়া দরোজার দিকে চাহিয়া ফিরিয়া আসিল। সত্য সত্যই চাঁদ যদি তাহার উপহাসটাকে প্রত্যয়ের কোঠায় ফেলিয়া থাকে, তবে যে ঐ দুঃখী নিরাশ্রয়া মেয়েটা আহত চিত্তে গিয়া মার কাছে নালিশ করিবে এ-বিষয়ে কোন

ব্যত্যয় নাই। অজিত চক্ষু বুঁজিয়া কেবল এই অনাগত ফাঁড়া কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অজিতের বিবেচনায়, বিবাহের কথা উঠিলে চাঁদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা এ প্রকার ঠাট্টা-আমোদের পাত্র হওয়াও যেমন ভাগ্যলিপির কথা, আবা্ এ প্রকার ঠাট্টা করারও উপলক্ষ্য হওয়া তেমনি সৌভাগ্যের কথা,—কারণ এ সুযোগ হয়তো মানুষের জীবনে ভাগ্যদেবীর সুপ্রসন্ন হাসির ন্যায় একবার বৈ দুইবার আসেনা। এই নিছক সাধারণ রসটাও যদি চাঁদের কাছে কদর্থসূচক হয় তবুও কি তাহাকে বিবাহ দিবার বয়স হইয়াছে বলিতে হইবে!

প্রস্তরপ্রতিমার মতন বসিয়া থাকিয়া অজিতের আবিষ্ট নয়ন মুদিত হইয়া আসিতেছিল। কখন যে ভৃত্য যোগেশ আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেছে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। অল্পক্ষণ পরেই শুভ্রবসনা সুনন্দার প্রশান্ত করুণাময়ী মূর্ত্তি দরোজার এপারে দেখিয়া অজিতের দোষী মন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সুনন্দার প্রশ্নে তাহার মনের চঞ্চলতা যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ ফণিনীর ন্যায় বিবশ দেহে বিবরে প্রবেশ করিতে চাহিল। সুনন্দা অজিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে খোকা, দেবুকে খুঁজে পাস নি?

অজিত কতকটা আশ্বস্ত কণ্ঠে বলিল, কে বললে?

চাঁদ গিয়ে বললে, দেবুর নেমত্যন্ন হয়নি তো কেমন করে আসবে! তাই যদি হয় তবে আমায় জানাস্‌নি কেন? আমি না হয় যোগেশকে একটিবার পাঠিয়ে দেখতাম। কি যে করিস তুই, কোন কাজই সিজিল মিছিল করে শেষ করতে পারিসনে। এখন কি হবে, যার জন্য আমি এত আয়োজন করলাম—শিবহীন যজ্ঞ করে ফল কি? চাঁদ মুখ ভার করে বিছানা নিয়েছে। মেয়েটার যা' ও একটা ব্যবস্থার জন্যে এত আমার

চিন্তা, তার দিকে আর কারো নজর নেই, তুই তাকে পাসনি তো আমাকে আগে বলিসনি কেন, এখন আর সময় কোথায় যে আমি তাকে ডেকে আনি?

কথাটার মধ্যে সুনন্দা তাঁহার সমস্ত অভিযোগ ও বিরক্তির ঝাল ঢালিয়া মুখখানা আষাঢ়ের ঘন আকাশের মত বর্ষণাশঙ্কায় ভরিয়া তুলিয়াছিলেন। অজিত এতক্ষণ যে দিকে চিন্তা-রথ পরিচালিত করিতেছিল, সেই পথের কণ্টকিত ছবি বিদূরিত করিতে পারিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমি এমনি ঠাট্টা করেছিলাম। আর চাঁদীটা কিনা এত আহাম্মুক যে, তাই বিশ্বাস করলে? দেবু তো এলো বলে, সকালেই তো তাকে বলে এলুম, সে আরও বললে সন্ধ্যের সময়ই আসবে।

তাই না! বলিয়া সুনন্দা স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে অধরপ্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, মেয়েটার যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হয়ে থাকে!

চৌকাঠের ওপারে আর সুনন্দার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলিল না। অজিত উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। চাঁদ যে একেবারে নির্বোধ নয়, তাহারও ভালবাসার বয়স হইয়াছে, অন্যথা দেবব্রতের জন্য তাহার চিত্ত এমন অধীর হয় কেন ইত্যাদি যুক্তি আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। বুঝিল, যে বাঙ্গলা দেশের বালিকার প্রেমতত্ত্ব আয়ত্ব করিতে যেমন বয়সের বন্ধনও মানিতে চায়না এমন আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

৭

দূর ছাই, মাসিমার কথায় কি যায় আসে, মীনা নিজেই যখন যেতে বলেছে, তখন শুধু মাসিমার মুখ চেয়ে বসে থাকবে কে? দেখাই যাক্‌না!

মুখে একটা তাচ্ছিল্যসূচক আওয়াজ করিয়া নির্ম্মল মীনাদের গেটের দিকে পা বাড়াইয়া দিল। নিরাকুল সন্ধ্যার বুক চিরিয়া ওপারে চটকলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। গ্যাসের বাতির মুখোমুখা একটা সাগুগাছের নীচে সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। লোহার দরোজা আল্‌গা করিয়া সে উচ্ছৃত পা ফিরাইয়া আনিল। তাহার যাওয়া হইল না।

বাড়ী ফিরিবার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি এতক্ষণ তাহাকে উত্তেজিত করিতেছিল, সেগুলি যেন পলকে বেত্রাহত ছাত্রের মত মাথা নোয়াইয়া রাখিল। মীনার বাড়ী প্রবেশ করিতে আজ নির্ম্মলের সাহস নাই। পথে তাহার মন অবসাদে ভরিয়া উঠিল। বুকভরা অশান্তি ধারণ করিয়া সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কোথায় যায়! তাহার সকল ক্লান্তি, যে ক্ষুদ্র নীড় ঐশ্বর্য্যহীন আয়োজনে নিত্য তাহাকে বাহুবিস্তারে আহ্বান করে সেটি তাহার বাসাবাটী। সেখানেই সে আপনাকে বিছাইয়া দিল।

মীনা কি এত সহজেই তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে? যেখানে সে প্রত্যহ যাতায়াত করিয়াছে, কোনদিন সামান্য একটু সঙ্কোচের অবসর বিরল ছিল সেই বাড়ীর নিতান্ত কাম্য স্নেহচ্ছায়াটি কি তাহার চক্ষের সম্মুখে পরম কৌতুকময়ী বলাকার মত অস্ত-সরণীর কোলে মিলাইয়া যাইবে?

যে কারণে আজ নির্ম্মল মীনার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই তার একটু ইতিহাস আছে। অজিতের সঙ্গে কোন একটা মনোমালিন্যও এর কারণ নহে। মীনার সঙ্গে এমন কোন বিস্বাদ্ সংঘর্ষ হয় নাই, যার ফলে সে এ প্রকার একটা মর্ম্মান্তিক অপমানের তাপে তাতিয়া উঠিয়াছিল।

তাহার আসল বাধা—সে সুকুমারীকে ঠাওরাইয়াছিল। তাহার একদিনের তরেও মনে আসে নাই যে, শুধু মীনার মন পাইলেই মীনার পরে অচল প্রতিষ্ঠা দাবীর অধিকারী হওয়া যায় না। বরাবর সে সুকুমারীর নিকট হইতে প্রাণহীন অভ্যর্থনা পাইয়াছে, এবং এই অনুভূতিটা আজ যেন পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার মধ্যে সুকুমারীর মনের ভাবটার অঙ্কিত ছবিটি আবিষ্কৃত করিয়া গেল।

মীনার পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে আজ এক মাসেরও অধিক। শেষ পরীক্ষার পরদিন যখন নির্ম্মল অত্যন্ত উৎসাহ লইয়া মীনাদের বাড়ী যায়, মীনা যতদূর পারে তাহাকে যত্ন আত্তি দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে-ছিল ; এমন সময় সুকুমারী তাহাদের মাঝে আসিয়া নির্ম্মলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, বাছা, মীনু যে এত ভাল পরীক্ষা দিয়েছে, তার মূলে তুমি। তোমার সার্থক পরিশ্রম যদি মীনাকে প্রমোশন দেয়—অন্যথা মেয়ের আমার পয় কি পরিমাণ তাতো জানোই ; ভাবছিলাম, অজিত ছেলেটি যদি রাজী হয় তবে এই পরীক্ষার পরেই দুই হাতে এক করে দিই। তা তো হ'বার জোটি নেই! অজিত যে আজ ক'মাস ধরেই টিকি দেখাতে চায় না!

নির্ম্মলের মনে তখন একটু আশার প্রবঞ্চনা আলেয়ার মতন প্রদীপ্ত হইল। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল তাতে আর কি হয়েছে মাসিমা! উপযুক্ত মেয়ের বিয়ে উপযুক্ত বর আসবেই, তার জন্যে এত হন্তদন্ত হচ্ছেন

কেন? পাত্র কি এতই আক্কারা যে মীনার জন্য একটিও মেলে না? যে বিয়ে করবে না তার তোষামোদ করে লাভ কি?

সুকুমারী কিন্তু এই কথায় সন্তুষ্ট হন নাই। বরং চটিয়া গিয়াছিলেন। উত্তরে বাহির হইল, যাও যাও, ওরকম অলক্ষুণে কথা তুমি মুখে আনতে পারলে নিমু? তুমি এর কি বোঝ? আমি মানুষ চিনিনা আর তোমরা ছেলে মানুষ হয়ে এসব কথার নাড়ীনক্ষত্র জান বলে বড়াই কর? কি জ্বালায় পড়েছি! অজিতের মত একটি সুপাত্র চৌদ্দদেশ ঢুঁড়ে বের কর দেখিনি,—কেমন জহুরী?

কথাটার সারা গায়ে শ্লেষ ও অবজ্ঞার অঙ্গরাগ। নির্ম্মলের সমস্ত শরীর সাপের দেহের ন্যায় শীতল্ হইয়া গেল, সে আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া বলিল, তা কি আমি বলছি মাসিমা! ওর অনুপাতে হয় তো পাত্র নাও জুট্‌তে পারে, কিন্তু ও কোনকালেই সিধে হবে না, তাও বলে দিচ্ছি।

কি যে বকছ নিমু, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি গো? ওমা, বলিয়াই তিনি মীনার দিকে ঘূর্ণিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। পুনরায় তিনি বলিলেন, যাক গে বাছা, তোমার আর পরামর্শ দিতে হবে না। তুমি আমার মেয়ের জন্য যা' করেছ, তার আর ফেরৎ নেই। তোমার টাকা পেয়েছ তো?

নির্ম্মল যেন হঠাৎ মনুমেণ্টে উঠিতে উঠিতে ধপ্ করিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল। সুকুমারী যে, এই অতি সাধারণ কথাটার উপর দাঁড়াইয়া এমন অনাত্মীয়তার একটা ঢেউ দিতে পারেন, তাহা তাহার কল্পনাতীত। সে যেন নিদ্রোত্থিতের মত চক্ষু মেলিয়া সুকুমারীর দিকে চাহিয়া রহিল। সুকুমারী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, যাও বাছা, বাড়ী যাও। পর কোন দিন আপনার হয় না, হবেও না। মীনু

যদি বি, এ, পড়ে তবে হয়তো আবার তোমাকে টিউশানিতে বহাল করতে পারি। আমি খবর পাঠাব। আমারও যথেষ্ট কাজ আছে, বাজে গল্প করলে তো আর সংসার চলে না? মীনু একবার আয় তো মা, তোর বাবার ঘরের কাজকর্ম্মগুলো একটু তদারক করে যা!

সমস্ত গৃহকক্ষের নিবিড়তা এক নিঃশ্বাসে ওলট পালট করিয়া দিয়া সুকুমারী ধূমকেতুর মতন পর্দ্দার আড়ালে ডুব দিলেন। নির্ম্মল ও মীনা অবনমিত শিরে দুই ভিন্নদেশীয় বরবধূর ন্যায় স্তিমিত নয়নে বসিয়া কৌচের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল; নির্ম্মলের প্রাণের সমস্ত রস যেন সুকুমারী শুষিয়া লইয়া গিয়াছেন। লজ্জায় হতমানে তাহার বিরস দেহ আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কোন মতে সে আপনার দেহখানিকে স্কন্ধচ্যুত ভারী বোঝার মত তুলিয়া, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু মীনার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মীনা মুখ না তুলিয়াই ডাকিল, নিমুদা!

আবেগে, সন্ত্রাসে তাহার মনের কথা তালু পর্য্যন্ত আসিয়া নির্জ্জীব হইয়া যাইতেছিল। নির্ম্মল দরোজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া অসহায় সঙ্কুচিত মর্ম্মর মূর্ত্তির মতন মীনার দিকে তাকাইয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, কোন পরিতাপের বিষয় এতে নেই মীনু, যেখানে দাঁড়িয়ে এতদিন সেতু বাঁধছিলাম, তার তলে যে চোরাবালির ফাঁক রয়েছে, তা জান্‌তাম না। তুমি তো এ বাড়ীর কেউ নও, অন্যথা এর উত্তর যথাযোগ্যভাবে দিতে কসুর করি না। যাক, তোমরা মানুষের প্রাণের চেয়ে সম্পদের মূল্য দাও বেশী। তবে এটাও ঠিক, এ অপমান মানুষ কোনকালে হজম করবে না। তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হওয়ার কোন কারণ আস্‌বে না, তবে একটা আশীর্ব্বাদ তোমাকে করে যাচ্ছি মীনা, যে আদর্শের চাক্যচিক্য

তোমাদের কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তা' যেন সুখের গৌরবে মহান হয়ে ওঠে।

মীনা অনবসর মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, আমার ওপর কোন রাগ কোরো না নিমুদা! আমি এই চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিনে। আর তুমি কি মনে প্রাণে স্বীকার কর যে, আমি তোমাকে অপমান করবার মত ধৃষ্টতা রাখ্‌তে পারি? তুমি এ বাড়ীতে আস্‌বে না কেন? মা যদি কোন আপত্তিও করেন, তবে আমি বাবার কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়ে নেব। আজ তোমাকে আমার অতি অন্তরঙ্গ একটা কথা বলি। অজিতদার যতটুকু অধিকার এই বাড়ীতে আছে বলে ধারণা করছ, তোমারও ঠিক ততটুকুই বহাল থাক্‌বে; এর বেশী আর তোমাকে কি বল্‌বো!

কথাটা আনতমুখী মীনা যেরূপ উষ্মার সহিত শেষ করিল, সরল সহজ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের দিকে চাহিতে ঠিক ততটুকু শক্তির পরিচয় দিতে বলবতী হইতে পারিল না। শুভ্র নিষ্কলঙ্ক পাষাণপ্রতিমার মতন তাহার অনড় সুমিত মূর্ত্তিটির দিকে কিয়ৎকাল বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া থাকিয়া, নির্ম্মল একটি আগন্তুক পথিকের মতন বাড়ী হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু মীনার আশ্বাসপূর্ণ বাণীর কোনখানে হেঁয়ালীর ছাপ আছে কিনা তাহার বিচার করিবার শক্তি তখন তাহার পক্ষে থাকা যেমন সম্ভব নহে তেমনি ছিলও না। ফলে মীনার ধীর মসৃণ বাক্য এতদিন তাহার জীবন-যাত্রার পথের একমাত্র পাথেয় হইয়া ছিল,—ইহাই তাহাকে প্রস্তর-ফলকের মত পথের নির্দ্দেশ দিয়া মীনার বাড়ীর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করিত।

বিষয়টা নির্ম্মলের স্মৃতি-মন্দিরে এতদিন অর্গলে আবদ্ধ ছিল। কুসুমের সুরভি যেমন রহিয়া রহিয়া স্নিগ্ধ পুলক লীলায়িত করিয়া তুলে, তেমনি

তার কাঁটাও বেদনার সাক্ষীস্বরূপ একই অবলম্বনে আশ্রিত হয়। স্মৃতির সুরভি মানুষের আনন্দছবি অঙ্কিত করিয়া থাকে কখন?—যখন তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভরা তরণী খোলা পালে নিয়াস চলিতে থাকে তখনই। কিন্তু নানা কাজে উদ্‌ব্যস্ত মানুষ দিকহারা নাবিকের মতন হাল ছাড়িয়া বসিয়া যায়, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা ভোতা অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, তখনই তাহার অন্তরের স্মৃতির কাঁটাগুলি সদ্যজাত পোকার ন্যায় কিলবিল করিয়া উঠে। দুর্ব্বল মানুষের মর্ম্মে নাকি স্মৃতির কাঁটা বিঁধিয়া থাকে।

নির্ম্মলের স্মৃতিগুলি আজ আর তাহাকে কাব্যজগতের কল্পনায় অভিষিক্ত না করিয়া অতিবাস্তব কঠিন আঘাতে সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। মীনার বাড়ী হইতে ব্যাহতচিত্তে ফিরিয়া যখন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন তাহার মনোবিমানের বিচিত্র রঙ্ আর নাই—সেখানে সুকুমারীর বাক্যগুলি শাণিত তরবারির মত আকাশের কোমরে থাকিয়া কেবলি তাহাকে চোখ রাঙ্গাইতেছে!

মনে গ্লানি, দেহে অবসাদ, কল্পনায় ক্লান্তি কোথায় যেন কি একটা অঘটন ঘটিয়াছে তাই নির্ম্মলের নিশীথ শয়ন ভঙ্গনিদ্রভাবে অতিবাহিত হইল।

পরদিন চা পান করিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সর্ব্ব-সাধারণের জন্য বিশ্রামস্থলের অভাব কলিকাতায় নাই। নির্ম্মল যত জায়গায় পারিল নির্বান্ধব নির্জ্জন মন লইয়া পার্কে স্কোয়ারে বসিয়া দেহের রক্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। পসারিণী, যত বেলাই হোক, তাহার অবিক্রীত পসরাটি মাথায় লইয়া যেমন পথে বিপথে ঘুরিয়া মরে,—অবশেষে তিক্ত মনে অপস্রিয়মান রবিকরের ন্যায় গৃহে ফিরিয়া আসে, তেমনি নির্ম্মল

সংরাগের পসরাটি বক্ষে লইয়া সমস্তক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বাড়ী ফিরিল তখন মধ্যাহ্নসূর্য্য ঘড়ির কাঁটার ন্যায় হেলিয়া পড়িয়াছে। একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেসের ঠাণ্ডা বরফের মতন ভাতগুলি গলাধঃকরণ করিয়া সে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

একটু তন্দ্রার আবেশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল মাত্র। একটা মোটরের নিষ্ঠুর আওয়াজে তাহার ঘুমের আমেজটি বিভক্ত হইয়া গেল। উঠিয়াই সে মীনার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

সে মীনার কাছে যাইবে না কেন? মীনা বলিয়াছে, অজিতের অধিকার আর তাহার অধিকারে কোন উনিশ বিশ নাই। প্রাণের মধ্যে প্রবল দ্যোতনা আসিয়া তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিল, তাহার সকল সঙ্কোচ দ্বিধার মুখোসটি যেন সূর্য্যস্নাত ছায়ার ন্যায় অপসৃত হইল।

যে কথা সেই কাজ। আবার সেই সন্ধ্যা, সেই স্বল্প আলো আঁধারের মাখামাখি, সেই জনবিরল, ক্কচিৎ দৃষ্ট মোটর কম্পিত এলগিন রোড, সেই গ্যাসপোষ্টের বন্ধু সাগু গাছ, তারই কাছে সেই লৌহবক্ষপঞ্জর।

আজ আর কোন ভয় বা বিচার তাহার গতিপথে আব্‌রু টানিল না। এক রোখে মীনাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করিয়া উঠিতে লাগিল। সিঁড়ির সীমান্তবর্ত্তী স্থলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সহিত সে মীনার মুখোমুখী হইয়া, হঠাৎ স্থানুর মত দাঁড়াইয়া গেল। মীনা নীচের দিকে আসিতেছিল। সে এমন অজানিতভাবে নির্ম্মলকে দেখিয়াই প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, নিমুদা, এমন অকস্মাৎ এলে, একটা খবরও তো দিতে হয়! ভাগ্যিস্ এলে। কি খোঁজাখুঁজি তোমার জন্যে, তোমার তো বাড়ীর ঠিকানা জানিনে, না

হ'লে আমি নিজেই গিয়ে তোমাকে ডেকে আনতুম। এস উপরে আমার ঘরে।

আশ্‌মানী রঙের শাড়ীর আঁচলটা কোমরের নীচে আসিয়া যেন পা দুটি ছুঁই ছুঁই করিতেছিল। মীনার পশ্চাতে নির্ম্মল সুমুখের হল ঘরের বারান্দা ঘুরিয়া মীনার এগ্‌জিবিশন রুমে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। মীনা পাখার বোতামটা টিপিয়া আসিয়া নির্ম্মলের সুমুখে বসিল—দুজনের মধ্যে শুধু একটা টেবিলের ব্যবধান। মীনা প্রথম কথা বলিল,—কি আশ্চর্য্য অজিতদার চরিত্রটা, তোমাকে খবর দেবার কথা বল্‌লুম—বললে, আচ্ছা বলে দেব, কিন্তু কোথাকার কে!

নির্ম্মল ধীর কণ্ঠে বলিল, কই সে তো আজ দু'মাসের মধ্যে আমার ওখানে যায় নি!

তা জানি। জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দিলে, সময় নেই। কিন্তু কাল একজন মিষ্ট্রেস্‌কে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। তা যাক্‌।

কিন্তু কথাটার মাঝখানে নির্ম্মল লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মীনার মুখখানি বিদ্যুতাহতের ন্যায় জ্বলিয়া পুনরায় কয়লার মত কাল আভায় ভরিয়া উঠিল। মীনা পুনশ্চ বলিল, আশ্চর্য্য আর কিছু নয়, মানুষ যে, মুহূর্ত্তে কত পরিবর্ত্তনের অধীন তা' বলা দুষ্কর। না হ'লে মঞ্জুলা রায়কে নিয়ে অজিতদা সারা কলকাতা চ'ষে বেড়াতে পারেন, আর তোমাকে একটা খবর দিতে পারলেন না?

হুঁ, বলিয়া নির্ম্মল সংক্ষেপে কথাটাতে সায় দিয়া নীরব রহিল।

মীনা পুনরপি গৃহের শূন্যতা পূরণ করিল,—নিমুদা, সঙ্কোচ একটা পাপ নয়! সঙ্কোচের পূজা করতে অনেক সময় মেকী নিয়ে ভোজবাজী খেলতে হয়। কিন্তু এর গতি আবর্ত্তন ঠিক মিথ্যার ন্যায় নয় কি!

জানো তো, একটা মিথ্যা সাফাই দিতে গেলে হাজারটা অবান্তর ভিত্তিহীন কথা এর পিঠে চাপাতে হয়। সঙ্কোচ বাঁচাবার জন্যেও এমনি লুকোচুরি খেলতে হয়। কিন্তু আমি এই পাপের প্রশ্রয় দিতে যাব কেন! অজিতদার সঙ্গে আমার এতটা ভাল দেখায় কি?

ইহার উত্তরে নির্ম্মল কি বলিবে? অজিতের সম্পর্কে সে সব কথাই বলিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার জিহ্বা অজিতের প্রতি কুৎসা বা বিচীকির্ষার ভাবটা এমন একটা সাধারণ বিষয়ে প্রকাশ করিতে সুড়সুড়ি দিল না। সে টেবিলের উপর হইতে মীনার সেলাই-কাজের একটা অসমাপ্ত নমুনা লইয়া বিচক্ষণতার সহিত খরিদ্দারের চক্ষে দেখিতে লাগিল। মীনা অপর পক্ষের কোন উত্তর না পাইয়া যে, বিশেষ নিরুৎসাহ হইল তাহার কোন কারণ না দেখাইয়া বলিল,—আমার অবস্থাটা এখানে খুবই হাল্কা, তা সত্ত্বেও আমারই শক্ত হতে হবে। আমার ইচ্ছা, অজিতদার সঙ্গে কোন শেকড়ই রাখব না, কেটে উপ্ড়ে সাফ করে দেব। ছাই চাপা দিয়ে আগুন ঢেকে রাখার কোন সার্থকতা আছে কি? কথায় বলে ঋণের শেষ, আগুনের শেষ ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই জানো নিমুদা, অজিতদাকে কাল আমি বলে দিয়েছি, আর যেন আমাকে বিরক্ত না করেন। তুমি মনে করছ বোধ হয় যে, মঞ্জুলার পরেই আমার রাগ, তা মোটেই না। নিমুদা, আমাকে এত সঙ্কীর্ণ মনে কোরো না।

নির্ম্মল অকস্মাৎ অপ্রতিভভাবে বলিল, না না, তা কি আর আমি বলছি। তবে এত তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা, তাই কেমন ঠেকছে।

তাতে আর কি হয়েছে! ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই বা কি, যে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় মেনে নেব! অজিতদা কি মনে ভেবেছেন যে,

আমি তাঁর একটা খেয়ালের খোরাক ! মানুষ আর এক জনকে কখন অপমান করে, যখন তার ন্যায্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করে। যাকগে, তুমি এত ভেবোনা নিমুদা, আমারও একটা দৃষ্টি আছে, তার আলোতেই আমি আমার পথ বেছে নেব। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে ব'লব বলে এতদিন খুঁজ্‌ছিলাম। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে ?

বলিয়াই মীনা এমন সহজ স্বভাবশান্ত চাহনিতে নির্ম্মলের দিকে তাকাইল, এতক্ষণ যে তাহার মধ্যে কোন সমস্যার তরঙ্গ তোলপাড় করিতেছিল, তাহার কোন ক্ষীণ একটা ফালিও ঐ তেজস্বিনীর চক্ষুতে দৃষ্টি-গোচর হইল না। নির্ম্মল আপন মনে উত্তর দিল, কোথায় !

মীনা দুই কনুইয়ে টেবিলের উপর ভর দিয়া কহিল, আমরা কাল বাইরে বেড়াতে যাব, প্রথম লক্ষ্ণৌ গিয়ে কিছুদিন থেকে, তার পরে আরও পশ্চিমে যাব। ফেরবার পথে এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল, বেনারস, পাটনা হয়ে আসবার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হলে বেড়ানোটা বেশ আরামের হয় না কি ! চল না নিমুদা, তোমার আর এখানে এমন কি বাঁধাবাঁধি !

বাঁধাবাঁধি তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে তোমার মা তাতে রাজী হবেন তো !

নিশ্চয় হবেন, মাকে তুমি চেন না নিমুদা। বাইরে যেমনই দেখ, মা আমাকে বড় ভালবাসেন, এত ভালবাসেন যে, আমার একটা সামান্য কথাও তিনি রাখতে গিয়ে সব ছাড়তে পারবেন। নিমুদা, আমার মায়ের মত এমন মা ক'জনের হয় ! তুমি চল, আমি মাকে রাজী করিয়ে নিই গে।

আচ্ছা কাল সকালে এসে তোমাকে বলব। আমার আর কোন অসুবিধে ছিল না, কেবল মাকে একবার খবর পাঠাব। তা আমি

সকালেই করতে পারব। বারাসতে মা আমাদের বাড়ীতে থাকেন, ওঁর সঙ্গে দেখাটা করেই তোমাকে জানাব, কি বল !

তা' হলে এখানে কখন আস্‌বে !

দুপুরের আগে নয়।—বলিয়া নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল। মীনা আসন ত্যাগ করিয়া তাহাকে আগাইয়া দিবার জন্যে বারান্দা ঘুরিয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছিল। মীনার পিতা উমেশবাবু তাদের ডাকিয়া ঘরে বসাইলেন।

উমেশবাবু গড়গড়ার নলটায় মুখ লাগাইয়া ইজি চেয়ারে হেলান দিয়া, আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া, তিনি অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় বসিয়া বলিলেন, বাবা, নিমু, তোমাকে তো অনেক দিন দেখতে পাইনি। এম্, এ,র জন্য প্রিপারেশন করছ না কি ?

নির্ম্মল দুই হাত মার্জ্জনা করিয়া শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, না এম্-এ, পাশ দেবার কোন ইচ্ছা আপাততঃ নেই, তবে টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে আইন পরীক্ষাটা দেবার ইচ্ছা আছে।

উমেশবাবু বিজ্ঞের মত কহিলেন, হ্যাঁ, বাবা, লেখা পড়া যা'ই কর না কেন, অর্থকরী দিকটা ভুললে চলে না।

তাহাদের কথার মাঝে মীনা উঠিয়া উমেশবাবুর পশ্চাৎ দিকে চলিয়া আসিল। উমেশবাবুর দুই কাঁধের মাঝখান দিয়া দুইখানি হাত বাড়াইয়া কহিল, নিমুদা আমাদের সঙ্গে যাবেন বাবা! দু'মাস বাইরে থাকবো, অথচ সময়গুলো বাজে নষ্ট হবে। নিমুদা সঙ্গে থাকলে বরঞ্চ গান শিখতে পাব। তুমি কোন আপত্তি করোনা বাবা !

এই বলিয়া মীনা, পিতার মাথায় মুখ লাগাইয়া চুলের আঘ্রাণ লইল। উমেশবাবু স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, নিমু কি তোমার সঙ্গে যাবে মা, ওর কত কাজ থাকতে পারে।

মীনা কথাটার দৈর্ঘ্য কাটিয়া বলিল, আমি ওঁকে রাজী করাব। উনি মত দিয়েছেন। কেবল মার কাছে বলে আসবেন।

উমেশবাবু নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, জান নিমু, আমরা কাল পশ্চিমে যাচ্ছি! অজিতকে যেতে বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে। তার না কি সময় নেই। জমিদার মানুষ, সংসার আছে সম্পত্তি আছে, নিজের লেখা পড়া আছে, কেমন করে যায়ই বা। তা' যা' হোক, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারো?

নির্ম্মল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুকুমারী পর্দ্দার মধ্য হইতে বাহির হইয়া, একেবারে উমেশবাবুর পার্শ্বে আসন লইয়া, উমেশবাবুর কথাটার উত্তর দিলেন। বলিলেন, কেন যাবে না! অজিতই কি আমার পেটের ছেলে আর নিমু আমার পর! নিমু, বাবা, এ তোমার ঘর বাড়ী, তুমি বিদেশে থাক, তোমার আপনার বলতেও আমরা, হিতৈষী বলতেও আমরা। মেয়েটা আমার একলা যেতে চায় না—তা একজন সঙ্গী না হলে, ও ছেলে মানুষ থাকেই বা কেমন করে। তাই ভেবেছিলাম, অজিতকে বলে পাঠাই। সময় নেই সময় নেই করে যা'ও এল, কিছুতেই বাইরে যেতে চায় না। বলে কাজ আছে, তুমিই যাবে বাবা, নিমু—কি বল?

মীনা সাহ্লাদে নির্ম্মলের প্রতিভূস্বরূপ উত্তর দিল, হ্যাঁ মা, নিমুদা যাবেন বলেছেন।

নির্ম্মল তাহাদের উৎসাহ ও আগ্রহ এবং আত্মীয়তা বলবতী করিয়া সানন্দে স্বীকৃতি দিয়া বলিল, আজ তা' হ'লে উঠি মাসিমা।

সুকুমারী সদ্যভারমুক্ত স্প্রীংয়ের মতন উঠিয়া বলিলেন, দাঁড়াও নিমু, এ বেলা এখানেই খেয়ে যাবে। প্যারীকে বলে তোমার ঠাঁই করে দিচ্ছি। ওগো, তুমিও এসো খেয়ে যাবে? রাত করে খেলে তো সয় না।

পরিশিষ্টাংশ কথাগুলি উমেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া, সুকুমারী কাহারও প্রত্যুত্তর না শুনিয়াই বহিষ্ক্রান্ত হইলেন।

উমেশবাবুও কিছু সময় নীরবে আত্মস্থ ভাবে তামাক টানিয়া, উঠিবার সময় নির্ম্মল ও মীনাকে ডাকিয়া, সুকুমারীর আদেশ পালন করিতে উঠিয়া গেলেন।

৮

কথামত নির্ম্মল মা'র কাছে আদেশ লইয়া অপরাহ্নের দিকে মীনাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। এমন অকস্মাৎ, এমন অনাড়ম্বর আয়োজনে, এমন বিচার-বিবেচনার অনবসর মুহূর্ত্তে, সে যে মীনার সহচর হইতে গেল, তার মধ্যে নির্ম্মলের নির্ব্বুদ্ধিতা আছে কি না? থাকিলেই বা কি? যেখানে জীবন একটা উড়ন্ত তুলার মত দিশাহারা, প্রতিদিনের অনাবৃষ্টিতে প্রাণের উষর প্রান্তর কেবলি ফাটলে আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আতপদগ্ধ তরুর ন্যায় মন যেখানে উদয়াস্তের রঙীন স্বপ্নে বিভোর, নির্ম্মলের সে ন দেবায় ন ধর্ম্মায় জীবনের গতিভঙ্গীতে আবার হিসাব-সংযমের মায়াক্রন্দনের প্রয়োজন কি? কিছুই নয়। বাড়ীতে মা আছেন, তিনি অন্তরেও আছেন বাহিরেও স্নেহ সুষমায় কল্যাণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। কলিকাতায় যে টিউশানি ছিল তা'ও মীনার ভবিষ্যত পাঠ্যজীবনের গতানুগতিকতার অধীনে। থাকে মেস বাড়ীতে,—যেখানে মানুষ বাস করে অতিথির মত, —সেখানকার মানুষের দিন গেল না একটু পাপের অবসান হইল; ঘরে বসিয়াও মানুষ ঘরের স্নেহ পায় না; এ যেন ধর্ম্মশালায় বাস করিয়াও ধর্ম্মাবতারের দর্শন সৌভাগ্য কোন দিন লাভ করিতে না পারা।

বস্তুতঃ এই প্রকার কালনেমীর কোন দিকেই কোন আলোর সন্ধান মেসবাসীর মেলে না। নির্ম্মলও এই ভাবে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দিন কাটায়। এমন অবস্থায় একটি যুবতীর সাগ্রহ আপ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করিতে পারে এমন নীতিবাদী বোধ হয় পৃথিবীতে এখনো জন্মায় নাই। সুতরাং নির্ম্মল যে, একটা বিরাট নিস্তরঙ্গ নীলাম্বুর ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিতে কণা মাত্র

দ্বিধার আঘাত খায় নাই, তাহা তাহার ধীর নম্র অথচ প্রাঞ্জল কথাবার্ত্তায় খুব স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট হইয়া যাইতেছিল।

ট্রেণ অনর্গল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যখন বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া গেল তখন শুক্লা একাদশীর চাঁদ আকাশের মেঘাস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে ব্যস্ত। এ সময়ে গাড়ীতে বসিয়া সকলের মনেই একটা ভাব আসে, গাড়ীর মধ্যে কোন ভাবুক দেশীয় গান গায়, প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মধ্যে মিশিয়া সেই গান এমনই অপ্রমেয় আচ্ছন্নতা ব্যাপ্ত করে যে, তাহাতে যাত্রী মাত্রেরই অন্তরের কোমল অঙ্গগুলি আলাপ জুড়িয়া দেয়।

ট্রেণ ছুটিয়াছে তীরের মতন। চারিদিকের গাছ-পালার নিরবসাদ গতি স্বপ্নের মায়াজাল সৃজন করিয়াছে। ধীরে ধীরে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইতে চলিল। উমেশবাবু ও সুকুমারী ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু শীত করিতেছে। মীনা একটা র‍্যাপার খুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে নির্ম্মলের সহিত আলাপ করিতেছিল।

নির্ম্মলের দৃষ্টি বাহিরে আবদ্ধ, কিন্তু মন তাহার শান্ত অন্তরের কোণে বসিয়া মীনার কথা লইয়া ব্যস্ত। মীনা এতক্ষণ তাহার মুখোমুখী বসিয়া গল্প করিতেছিল। মীনার একহারা, না মোটা না পাতলা শরীরের লীলা-বিলাস, কাল কাল বেণী সংন্যস্ত চুল, তাহার গায়ের মিষ্ট মধুর গন্ধ যেন এতক্ষণ তাহাকে যাদুকরের মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মনের ক্ষুধার নিরসন করিবার বুঝি মীনাই একমাত্র সম্বল।

একটা কথা তাহাকে মাঝখানে আঘাত করিয়াছিল। মীনা, মঞ্জুলা ও অজিতের কথা লইয়া যখন উত্তেজনায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ঐ স্বল্প-ভাষিণী যুবতীর অন্তরের রন্ধ্রপথে যেন একটা বিক্ষোভ বৈদ্যুতিক মশালের তেজে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই মীনা আত্মসম্বরণ করিয়া বলিয়াছিল,

তুমি বলছ নিমুদা, মঞ্জুলার বয়স যদি তেইশ চব্বিশ হয় তবে অজিতদার সঙ্গে তার বিয়ে হবার সম্ভাবনা কোথায় ? এ কথার কোন ভিত্তি নেই। হামেশা দেখছি, বারো বছরের একটা মেয়ে আশী বছরের একটা বৃদ্ধের সঙ্গে অক্লেশে ঘর করতে পারে। অজিতদা যে মঞ্জুলাকে বিয়ে করবে তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু এত সহজেই যে ওঁর মত বদলে গেল তার জন্য আপ্‌শোষ হয়। আচ্ছা নিমুদা, ঘরসংসার পেতে থাকাটাই কি মানুষের একমাত্র কাম্য ?

নির্ম্মল বলিয়াছিল, এক রকম তাই বটে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সত্য অব্যর্থ। নারীর জাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা জানো তো ? মা হওয়া। মা হতে না পারলে নারীর জীবনে আর ফলহীন বৃক্ষে কোন তফাৎ থাকে না।

স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের পক্ষে এ প্রথাইত শান্তিময়ী,—বলিয়া মীনা চুপ করিল।

নির্ম্মল পুনরায় বলিল, স্বাধীনতার সূত্র নিয়ে তর্ক আছে যদি স্বীকার কর তবে তোমার কথাটাই সিদ্ধান্ত নয়। ফলভারে বৃক্ষ নত হয় বটে কিন্তু তাতে সে অস্বস্তি বহন করে না বরঞ্চ স্নিগ্ধ সৌরভ বিতরণ করে। মানুষও সংসার করে, পুত্র কন্যার মুখ দেখে শুধু বাধ্য বাধকতায় পড়ে নয়, এটা তার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রেরণারই ফল। মুখ্যত! নারী এই মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাটিকে পোষণ করে, এটা তার সহজাত। আর এখানেই তার মহিম্ন-মূর্ত্তির পরম স্বার্থকতা। এ কারণেই নারী পুরুষের নিকট মাতৃত্বের আবেদন করে। এ থেকেই ঘর-সংসার, এ থেকেই বিয়ের আয়োজন। বিয়ে একটা অনুষ্ঠান মাত্র, আসলে তার মধ্যে যে একটি ইঙ্গিত আছে তাকে স্বীকার করাই নরনারীর মিলন।

নির্ম্মলের কথা শুনিতে শুনিতে মীনা র‍্যাপার টানিয়া শুইয়া পড়িয়া-

ছিল। সুতরাং নির্ম্মল এতক্ষণ অনেক কিছু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। মীনাকে তাহার মধ্যে অন্তরঙ্গ ভাবে পাওয়ার, যত প্রকারের আনন্দ আছে, তাহার প্রত্যেকটি ছবি যেন ছায়াচিত্রের মত তাহার মাথার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। বাহিরের নীরবতার বুকের মধ্যে ট্রেণের প্রবহমান ধ্বনি নির্ম্মলের মনের মধ্যে তুরীয় ভাব ছড়াইয়া যাইতেছিল। সম্মুখে শায়িত মীনার সৌম্য মূর্ত্তিটি যেন তাহার এত কাছে থাকিয়াও বহু দূরের সুরম্য স্বপ্নে মহিমান্বিত, গরবিণী।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। নির্ম্মলের নয়নে ঘুমের লেশমাত্র নাই। অদূরে উমেশ বাবু ও তাঁহার পত্নী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। একবার পাশ ফিরিতেই স্বচ্ছ অনাবিল চন্দ্রকিরণ আসিয়া মীনার চোখের উপর পড়িল। সে চক্ষু মেলিয়া উদাসদৃষ্টি নির্ম্মলকে নির্‌ঘুম অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ঘুমোওনি, সেই থেকে বসে আছ?

নির্ম্মল যেন অজ্ঞাতসারে এমন কিছু একটা খুঁজিতেছিল, যাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সে আনন্দে আত্মহারা বিহ্বলের প্রায় বলিয়া উঠিল, বস, ঘুম তো চিরকালই আছে। কিন্তু আজকের মতন এমন রাতটা আর পাবো কি?

মীনা নির্ম্মলের মুখোমুখী বসিয়া নির্ম্মলের চোখের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সমস্ত রাত, কালও সমস্ত দিনটা ট্রেণে থাকতে হবে তা জানো, এখন না ঘুমোলে যে শরীরের তাল রাখতে পারবে না। না নিমুদা, এখন ঘুমোও, ক্রমেই ঠাণ্ডা পড়ছে। না ঘুমোলে কাল সকালে মাথা তুলতে পারবে না।

নির্ম্মল একটু হাসিয়া বলিল, তুমি তো এক ঘুম ঘুমিয়েছ, এত তাড়া কি!

অসমাপ্ত কথার মাঝখানে মীনা রাগত ভাবে বলিল, তা আমায় আগে বললেই আর ঘুমোতাম না। তুমি যে জেগে থাকবে তা কি আমি জানি? এখন ঘুমোও নিমুদা, আগে তুমি ঘুমোলে তবে আমি শোব।

বলিতে বলিতে মীনা নির্ম্মলকে এক প্রকার জোর করিয়াই শোয়াইয়া দিল। মীনা তাহার স্নমুখের বেঞ্চিটাতে শুইয়া র‍্যাপারটা গুছাইয়া লইল।

নির্ম্মল সুচতুরা মীনার বিচক্ষণতায় আনন্দ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইল আরো তাহার প্রভাবস্থায়িত্বের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া। সে এতক্ষণ বসিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, এই রাত্রে বিনিদ্র থাকিয়া নিজের একান্ত একাকীত্বের মাধুর্য্য উপভোগ করিবে।

কিন্তু তাহার সকল প্রতিজ্ঞার গোড়ায় ছাই দিয়া, মীনা এত সহজেই যে, তাহাকে ঘুমাইতে বাধ্য করিতে পারে, এ ধারণাটা তাহার সম্মুখে মায়াজাল সৃজন করিল। মাথার সন্নিকটে জানালাটা বন্ধ করিয়া সে শাসিত বিদ্যার্থীর ন্যায়, বাঁধা-সেতারের তারের মতন লম্বা হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় তাহারা লক্ষ্ণৌ পৌছিল। বাড়ী আগেই ভাড়া করা ছিল। তাহারা মালপত্র লইয়া রাত্রে সে বাড়ীতে তীর্থযাত্রীর মতন অগোছান অবস্থায় কাটাইয়া দিল।

তার পরদিন মীনা ও নির্ম্মলে মিলিয়া সমস্ত বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া যখন চা পান করিতে গেল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

অপরাহ্নের দিকে উমেশবাবু বাড়ীর স্নমুখে লনের এক কোণে বসিয়া স্নিগ্ধ বাতাস সেবন করিতেছিলেন। তাঁহারও চা পানের সময়

হইয়াছিল। সুকুমারী প্যারীকে সেখানেই টিপয় সাজাইয়া, চা দিতে আদেশ দিলেন। সকলে সেখানেই সমবেত হইল!

চা দেওয়া হইল। উমেশ বাবু নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে নিমু, এখন আর বাইরে যেয়োনা। কাল সকালে মীনুকে নিয়ে সব কিছু দেখাব'খন। লক্ষ্ণৌ স্থানটি বেশ মনোরম।

নির্ম্মল চা খাওয়া প্রায় শেষ করিয়াছিল। সে উত্তরে বলিল, তা ঠিক। মনে হচ্ছে সহরটির মধ্যে প্রাণ আছে। কাল থেকে একটা প্রোগ্রাম করে নিতে হবে।

মীনা যেন কথাটা তাহার প্রাণের স্বপ্ন ছিল বুঝাইয়া বলিল, সত্যি একটা চার্ট করে নিয়ে কাল সব তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব নিমুদা, এখানকার চিড়িয়াখানাটি অতি আশ্চর্য্য!

সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানার একটা পরিচয় দিয়া ফেলিল। সুকুমারী এতক্ষণ তাহাদের আলাপ আলোচনা গিলিতেছিলেন। অবশেষে যখন চায়ের আসর ভঙ্গ হয় হয়, এমন সময় তিনি বলিলেন, তা অজিতকে একখানা পত্র দিয়ে আমাদের পৌঁছা খবরটা দিলে ভাল হয় না গো! এই কথাটা উমেশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া তাহা সকলেই বুঝিল।

উমেশ বাবুর তামাক আসিয়াছিল। তিনি গড়গড়ার নলটী দাঁতে চাপিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, নিশ্চয় দিতে হবে। মীনু, কাল একটা চিঠি দিয়ে দিস্‌তো।

মীনা যেন কথাটা হৃদয় দিয়া পালন করিতে গররাজী। সে বিরক্তির ঝাঁঝে কর্কশকণ্ঠে বলিল, আমি পারব না বাবা! তুমি নিজেই লিখে দাও না।

সুকুমারী যেন একটু আঘাত পাইলেন। তিনি রাগতভাবে বলিলেন,

কেন পারবে না। বেশ না পারো তো আমি নিমুকে দিয়ে লিখিয়ে নেব'খন। মেয়ের যেন সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

কথা বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উমেশ বাবু তাঁহাকে শোনাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, দেবে'খন একখান চিঠি। মীনু মা লক্ষ্মীটি, দেবে তো ?

সুকুমারীর কথার ভঙ্গী ও উমেশ বাবুর স্নেহ মীনাকে সম্মত করাইল। সে ছোট একটি, আচ্ছা, বলিয়া কাহারও কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই সভা ত্যাগ করিল। এমনিভাবে তিক্ত আবহাওয়ায় তাহাদের সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে নির্ম্মলকে লইয়া মীনা সহরের কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া আনিল, মধ্যাহ্নে মীনা তাহার শয়নকক্ষে বসিয়া অজিতকে পত্র লিখিতে বসিল। নির্ম্মল অবশ্য এ সংবাদ জানিত না, কাজেই সে, কি একটা কাজে মীনার ঘরে আসিয়া হাজির হইল। অকস্মাৎ নির্ম্মলকে দেখিয়া মীনার মুখখানি বেগুনের মত রং ধরিল। সে পত্রখানি এমন ত্রস্ত হস্তে চাপা দিল যে, তাহার এই গোপন করার ভাবটা বুঝিতে নির্ম্মলের মুহূর্ত্তক্ষণ বিলম্ব হইল না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইবার জন্যে বলিল, না আগে তোমার কাজ হোক তার পর আসব।

নির্ম্মলের এক পা দরোজার বাহিরে সংযুক্ত হইয়াছিল। মীনা আসন ছাড়িয়া নির্ম্মলের সুমুখে দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি চলে যাচ্ছ যে বড় ? সবাই মিলে আমাকে বাঁদর নাচাবে মতলব করেছ, এই তো! বলিতে বলিতে তাহার গদগদ কণ্ঠের অভিমান অশ্রুজলের মধ্য দিয়া ঢেউ খেলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া রহিল। উন্মুক্ত অশ্রু বর্ষণে টেবিলের অয়েলক্লথ ভিজিয়া

উঠিতেছিল। নির্ম্মল তাহার পাশেই চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হল মীনা, আমার দোষটা কি বল না, যদি কোন অন্যায় করে থাকি,—

তাহার কথা শেষ হইবার অবসর না দিয়া, মীনা পুস্তক-ঢাকা চিঠিখানি নির্ম্মলের সুমুখে ফেলিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নির্ম্মল পত্রখানা পড়িয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল। সে মীনার পত্র ফিরাইয়া বলিল, তা অজিতকে পত্র লিখছ, আমায় বললেই হত! আমি ভাবলুম, বুঝি কোন গোপনীয় কিছু আছে।

আমি তো না-ই করেছিলাম। অজিতদাকে পত্র লেখার আমার কি গরজ? তবু জোর করে আমাকে দিয়ে লেখাতে হবে।

অভিমানিনী মীনার কথার অর্থ বুঝিয়া নির্ম্মল আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া বলিল, তাতে আর কি হয়েছে? তাকে পত্র দিতে তো আর আমি নিষেধ করিনি? তাকে আমাদের পৌঁছা-সংবাদ তোমরা না দিলেও আমি দিতাম। যাক্‌গে, আমি যে কথা বলতে এসেছিলাম। আজ বিকেলে একটা লাইব্রেরীর মেম্বার হয়ে আসব, তুমি কি বল।

কপোলের ক্ষীণ অশ্রুরেখা শুকাইয়া মীনাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল. দাঁড়াও, আমি পত্রখানা শেষ করে তোমার সঙ্গে যাব। আমিও মেম্বার হব। পড়াশুনা দরকার। নিমুদা, হারমোনিয়ম তো এনেছি; আজ রাত্তিরে আমাকে একটা নতুন গান শেখাবে?

হবে’খন, বলিয়া নির্ম্মল আপন কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল।

স্থান পরিবর্ত্তন ও বিস্তৃত অবসর পাইয়া কিছুদিনের মধ্যে নির্ম্মলের পুরাতন সাহিত্য সাধনা জাগিয়া উঠিল। তাহার বহির্মুখী প্রেরণাগুলিকে

আত্মস্থ করিয়া সে নির্জ্জনতা গ্রহণ করিয়া ফেলিল। নিজের ঘরখানিতেই সে সমস্ত দিন রাত্রি যাপন করিয়া যাইত, কিন্তু কেবল মীনার তাগাদায় সকাল বিকালে বেড়াইতে বাহির হইতে হয়। একখানা উপন্যাস লিখিবার দিকে তাহার এমন ব্যস্ততা বাড়িয়া উঠিল যে, তাহার আহারে ঔদাসীন্য স্ফুটতর হইয়া উঠিল। তাহার একটা কারণও যে ছিল না তা নয়। সে জানিত যে, তাহার জীবনে চাকুরীর সম্ভাবনা অল্প। প্রথমতঃ উমেদারী তাহার কাছে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—চাকুরী খুঁজিতে গিয়া কলিকাতার নির্দ্দয় পথের বুকে তাহার কয়খানি জুতা যে, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া সে চাকুরীর লালসা বর্জ্জন করিয়াছিল। মনে মনে একটা স্বপ্ন ছিল, যদি আইন পরীক্ষার ফি জোগাড় করিবার কোন সন্ধান পায় তবে একবার মরণ-কামড় দিয়া দেখিবে। কিন্তু এদিকটারও কোন নিরিখ সুদূর পরাহত ভাবিয়া, সে সাহিত্যের বন্ধুর পথে অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বই লিখিতে সুরু করিল।

সমস্ত মধ্যাহ্ন নিজেকে বন্দী করিয়া হয় লেখে না হয় পড়ে। সন্ধ্যার পরেও তাই। কোন দিন সকাল হইতে বসে আর যে পর্য্যন্ত মীনা আসিয়া ঠেলিয়া স্নানের ঘরে না পাঠায় সেই পর্য্যন্ত আপনার ঘরখানিতে আবদ্ধ থাকে। তাহার এই পরিবর্ত্তন হয় তো বিধির লিখন, কিন্তু মীনার জীবনস্রোত এই নব অভ্যুদয়ের মাঝখানে যেন আপন সত্বাটিকে খুঁজিয়া পাইল। নির্ম্মলের ঔদাসীন্য যত বৃদ্ধি পাইল, মীনার আগ্রহ যত্নাভিলাষ যেন শতগুণ হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া আদর যত্ন আত্তি করিলে যে, সে নির্ম্মলকে সাহায্য করিতে পারিবে এ তাহার একটা বাতিক হইয়া উঠিল।

সেদিনও নির্ম্মল রাত্রের আহারের পরে কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছিল। লিখিতে লিখিতে কখন যে রাত্রি বারোটায় গড়াইয়া পড়িল, তাহা নির্ম্মল আদৌ টের পায় নাই। মাথাটি টেবিলের পরে রাখিয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সম্মুখে বাতায়নের পাশে একটা লাল ডগ্‌ডগে পাথরের সড়ক। নম্র চন্দ্রকিরণে পথখানি ঘুমাইতেছিল। তার পরেই একটা জনারির ক্ষেত আলো আঁধারের জাল বুনিয়া শিশিরে ভিজিয়া উঠিতেছিল। জনারি ক্ষেত্রের মাঝে কৃষকগণ বন্য শূকর তাড়াইবার জন্য একটা মাচা বাঁধিয়া তার উপরে বসিযা কেনেস্তারা পিটিতেছিল।

এমন সময় নির্ম্মলের বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া মীনা ডাকিল, নিমুদা, নিমুদা ওঠ ঘুমোচ্ছ যে, রাত যে দুটো বেজে গেছে।

স্বপ্নোত্থিতের মত নির্ম্মল চকিত লোচনে মীনাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য অভিভূতের ন্যায় চৌকী হইতে লাফাইয়া উঠিল।

একি, তুমি বাইরে যে, ভেতরে এস, বলিয়াই নির্ম্মল জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

মীনা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, দবোজা বন্ধ করে রেখেছ, আমি ঢুকব কেমন করে।

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি দরোজা খুলিয়া দিতেই মীনা একলাফে ঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিছানায় বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। নির্ম্মল তাহাকে কয়েকবার ডাকিয়া হতভম্বের ন্যায় মূঢ় নয়নে চাহিয়া রহিল। মীনা ধীরে ধীরে বলিল, নিমুদা বাইরে এত ভয় করছিল, আমার সুমুখ দিয়ে একটা বুনো শূয়ার এমন তেড়ে মেড়ে চলে গেল, যে আমি সেখানেই পড়ে যাচ্ছিলাম।

নির্ম্মল চেয়ার টানিয়া ধপ করিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি এত রাত্তিরে এলে কেন, বাইরেই বা গেলে কেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে! ছি, ছি, এমন ভাবে কেউ বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানে কত শূয়ার, কত জানোয়ারই না আসতে পারত!

তুমি যে এখনও আলো জ্বেলে বসে ঘুমুচ্ছ, তাই তোমাকে জাগিয়ে দিতে এলাম। দরজা যে কতকক্ষণ ঠেলেছি তার অন্ত নেই, শেষে কোন উপায় না দেখে ভাবলুম যে, জানালা যখন খোলা আছে তখন একবার এদিকেই চেষ্টা করা যাক। কিন্তু এখানে এমন হোঁচট খেয়েছি, এই যে পায়ের ডগাটায়,—বলিয়া সে বাঁ পায়ের আঙ্গুল দেখাইবামাত্র নির্ম্মল আতঙ্কে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সে অসংযত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, করেছ কি, আঙ্গুল যে গেছে, বোকা মেয়ে কোথাকার। দেখি একটা ভিজে ন্যাক্‌ড়া বেঁধে দিই।

ঘরে আর কিছু না পাইয়া নির্ম্মল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ভিজাইয়া লইল। আঙ্গুল বাঁধিয়া দিবামাত্র মীনা টেবিলের উপর নির্ম্মলের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ঝুঁকিয়া বলিল, লুকিয়ে লুকিয়ে উপন্যাস লিখছ, তাই রাতে ঘুম নেই!

বলিয়া, সে হাতের লেখা খাতাখানির দিকে পড়ুয়ার দৃষ্টিতে চাহিল। কিন্তু নির্ম্মল তখন এই লঘু প্রসঙ্গটাতে নিজেকে জড়াইতে পারিল না। মীনার এ স্থানে এই রাত্রে অবস্থিতিটা তাহার কাছে নিতান্ত অশোভন মনে হইতেছিল। অথচ সে মীনাকে স্পষ্টভাবে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার মতন শক্তি পাইল না। এই অক্ষমতার সমস্ত দায়ভাগ সে মীনার উপর অর্পণ করিয়া ভূতগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত বাড়ীখানি গভীর স্বপ্নাভিভূত। একটি ফুল্ল যূথীগুচ্ছের মতন সুউজ্জ্বল কান্তিতে

গৃহখানি আলোকিত করিয়া মীনা উপবিষ্ট। এমন সময়ে উমেশবাবু অথবা সুকুমারী আসিয়া পড়িলে যে, নিতান্ত লজ্জায় পড়িতে হইবে, একথা ভাবিয়া যেন নির্ম্মলের সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল। ঘুমন্ত বাড়ীর প্রত্যেকটি জড় পদার্থও যেন তাহার সম্মুখে প্রাণবন্ত হইয়া এই অসহায় অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। মীনা যে কেন অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিল, কেনই বা এমন নিঝুম রজনীতে তাহার ঘরে আসিয়া দায়িত্বজ্ঞানের দারিদ্র্য প্রদর্শন করিল, ভাবিতে ভাবিতে কূল কিনারা না পাইয়া তাহার মনখানি খরস্রোতে বাঁশের খুঁটির ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার সকল চিন্তা, সংশয় আতঙ্কের নিরসন করিবার জন্যেই বোধ হয় ভগবান সহায় হইলেন। বাহির হইতে ভৃত্য প্যারীচরণ ডাকিল, দিদিমণি!

মীনা যেন এতক্ষণে কৃতকর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, কে প্যারী, এই যে দরজা খোলাই আছে।

প্যারী ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল, মা বলছেন, অনেক রাত হয়েছে? এখনো কি আপনারা লেখা পড়া করছেন নাকি?

না এই যে হয়ে গেছে, চল শুতে যাই।—বলিয়া মীনা গমনোদ্যতা হইল। নির্ম্মল মীনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কথাটাতে সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ এই যে প্রায় আড়াইটা বাজে!

মীনা ততক্ষণে চৌকাট পার হইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় সে নির্ম্মলের কথা শুনিতে পায় নাই। অদৃশ্য মীনার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ক্লেশটা যেন ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া গেল। সে ঝপ করিয়া দরোজায় খিল দিয়া কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

৯

অজিত মীনার পত্রখানি পাইল। কোন উৎসাহ বা ঔজ্জ্বল্যের লক্ষণ তাহার মুখের চতুর্দ্দিকে ফুটিল না। মনে হয় যেন, মীনা লক্ষ্ণৌ কেন পৃথিবীর যে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গেলেও অজিতের মনে টোল পড়ে না। এই প্রকার বৈরাগ্য তাহার যে আজই সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে। মীনাদের লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পূর্ব্বদিনে সে মঞ্জুলাকে লইয়া মীনাদের বাড়ী গিয়া যে প্রকার ঔদাসীন্য মীনার নিকটে পাইয়াছিল, তাহার প্রদাহটাও সে অতি সহজেই ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিয়াছিল। ইহার জন্য কোন ক্ষোভ, অনুতাপ বা নির্ম্মলের প্রতি কোন বিচীকির্ষার কারণ পাওয়ার অবসর ছিল না। কেন না মীনাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই মঞ্জুলা তাহাকে লইয়া সিনেমায় যাইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বস্তুতঃ অজিত মঞ্জুলাকে ডিঙ্গাইয়া মীনার জন্যে হাত বাড়াইবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

মঞ্জুলা প্রত্যহ আসে, চাঁদকে পড়ায়, নিজে অজিতের কাছে পড়িয়া যায়। কোন কোন দিন অধ্যাপনার পরে অজিতের সঙ্গে হাওয়া খাইবার জন্য বাহির হয়। পথে মঞ্জুলা অজিতকে একা পাইয়া অনেক কথা বলে,—তাহার জীবনের ধারাটা একটি খাতে, এত দিন নির্জ্জন নিরালায় মৃদু তরঙ্গ রচনা করিয়া চলিয়াছিল। ইহার ক্ষীণ স্রোতোরেখা অজ্ঞাতসারে তাহার অন্তরের অব্যক্ত প্রার্থনাটীকে কোন এক দূর জলধির স্বপ্নে বিভোর করিয়া রাখে; বাহিরের স্বপ্নময় আকাশ, নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপ, রভসমগ্ন বিহঙ্গম, উদাস গাঙচিলের একটানা ক্রন্দন, তটপ্রান্তে

ঝোপঝাড়ের অন্তরালে গৃহবিরাগী পথচারীর প্রাণ মন উদাস করা গ্রাম্য গীতি, সকলের মিশ্রিত কল্পনা-রঙ্গীন অনুভূতি তাহার ক্ষুদ্র ভোগবতী ধারার গতিচাঞ্চল্যে অসীমের আনন্দ জাগাইয়া তুলে। অজিতের সাহায্য লাভ করার পর হইতে তাহার চিত্তের মনিকোঠায় আবার সেজ সদ্যঘৃতসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কোণায় যত কামনাশিশু অস্ফুট কুঁড়ির মতন কাঁদিতেছিল, সবগুলি যেন রঙ্গে রসে সৌরভে তরুণ হইয়া ঝলমল করিতেছে। মঞ্জুলার কুমারী জীবনের আহত লিপ্সা যেন অজিতকে ঘিরিয়া একটি পল্লবনীড় রচনার সন্ধান পাইল।

এ কারণে মঞ্জুলা তাহার সকল একাগ্রতা নির্ব্বাক শ্রদ্ধা লইয়া সর্ব্বক্ষণ অজিতের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পায় যে, সে তাহার জীবনের যতগুলি প্রেম-অনুভূতির সন্ধান পাইয়াছে, সে সব একমাত্র অজিতের সঙ্গে মিলামিশার পর হইতে। অজিত এ সমস্ত কথা শুনিয়া কোন বিরুদ্ধ উক্তি করে নাই এবং ইহাতে অজিতকে আরো নিকটতর করিয়া পাইবার সাহস তাহার বুকের মধ্যে বেড়া-আগুনের মত বাড়িয়া যাইত। এমনি ভাবে তাহাদের দিনগুলি দক্ষিণ বাতাসের পুষ্প গন্ধের ন্যায় রহিয়া রহিয়া বহিয়া যায়।

মীনার চিঠিখানা এ কারণে অজিতকে তত প্রলুব্ধ করিবার পথ পায় নাই। পত্রখানা সে যেমন পাথর চাপা দিয়া দেরাজের মধ্যে রাখিয়াছিল তেমনি ভাবে আবর্জ্জনা স্তূপের ন্যায় অপসারিত হওয়ার মুহূর্ত্তটির অপেক্ষায় পড়িয়াছিল।

একদিন অপরাহ্নের মিঠাকড়া রৌদ্র অজিতের জানালার পর্দ্দাগুলি কাঁচের ন্যায় রঙের জাল বুনিতেছিল। অজিত তখনো একটা বই খুলিয়া কেদারায় পা তুলিয়া বসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বইখানি রাখিতে

গিয়া মীনার চিঠিখানা তাহার নজরে পড়িল। অকস্মাৎ যেন পত্রের অক্ষরগুলি জীবন্ত পোকার ন্যায় তাহার চক্ষের সম্মুখে কিলবিল করিয়া উঠিল। পত্রখানা তুলিয়া অর্দ্ধেক পড়িল। এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টার বিরক্তিকর ধ্বনি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বারান্দার কোণে লইয়া গেল। একটা পা চেয়ারে তুলিয়া সে টেলিফোন ধরিয়া বুঝিল যে, মঞ্জুলা তাহাকে ডাকে।

অজিত বলিল, কালকে আপনার বাড়ীতে কি আছে? অমনি? তা' ভাল আমি আসব, তবে নেমত্যন্ন করতে পারব বটে কিন্তু নিমুকে তো বলবার জো নেই। সে এখন লক্ষ্ণৌ আছে।

কিছুক্ষণ টেলিফোন কানে লাগাইয়া হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, এই কথা! আপনি আপনি করলে মানুষ পর হয়ে যায়? তা' বেশ, এবার থেকে তুমি বলেই ডাকব। এবার সুখী হবে? আমাকেও তুমি বলবে? তা হলে তো ভালই হয়। আপনি আপনি করতে গেলে প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না। যাক্ তা হলে, তোমার বাড়ী নেমত্যন্নে যাব তাতে আবার আপত্তি থাকবে কেন মঞ্জু! আমরা লোভী মানুষ যেখানে ইচ্ছে খাবার নাম করে নিয়ে যেতে পারো।

কয়েক মিনিট নীরব। তার পরে পুনরায় বলিল, তা তোমার বাড়ীতে অভ্যাগতদের মধ্যে কলেজের মেয়ে ক'টি আছে বুঝি! না— আপত্তির কথা নয়, যাব যাব যাব বুঝলে,—আচ্ছা এসো! ঝপ্ করিয়া ফোন নামাইয়া অজিত ঘরে আসিবামাত্র চাঁদ প্রবেশ করিল। সে চাঁদের দিকে চাহিয়া দৃষ্টিটাকে ফ্ল্যাশ লাইটের মত ঘুরাইয়া বাহিরে লোহিত কোমল আকাশের পরে সংন্যস্ত করিয়া কহিল, তোর টিউটার আজ আর আসবে না বলেছে, ওর বাড়ীতে কি কাজ পড়েছে, মাকে বলিস্।

চাঁদ, আচ্ছা, বলিয়া জানাইল, তুমি এখন বেরিয়ো না, মার সঙ্গে কি দরকার আছে।

কিসের দরকার!

তা আমি জানিনে, আমাকে বল্‌লেন বলতে, এই। তবে মা আজ দুপুরে ভবানীপুর কাদের বাড়ী গিয়েছিলেন তা জানিনে। সেখান থেকে এসেই বললেন। মনে হয় কেউ আসবে, বলিয়া চাঁদ যেরূপ অকস্মাৎ আসিয়াছিল তেমনি বিনা কালক্ষেপে চলিয়া গেল।

অজিতের সর্ব্বশরীরে যেন একটা বৈদ্যুতিক তার ছোঁয়াইয়া চাঁদ চলিয়া গেল। ভবানীপুরে যে কারণে তার মা গিয়াছিল, তাহার অন্য কোন কারণ নাই। চাঁদের বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্তের জন্যে নিশ্চয়ই পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। এমন অসহায়তার সুযোগ পাইয়া, চাঁদের এমন অল্প বয়সেই যে মেয়েটাকে যূপকাষ্ঠে বধ না করিলে কি আসে যায় তাহা সে কিছুতেই বুঝে না। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, চাঁদও এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করে না। ভাবিতে ভাবিতে, বাঙ্গালা দেশের এই প্রথাটার প্রতি ও তাহার অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতি একটা বিদ্বেষের জ্বালা তাহার অন্তরে বসিয়া বুকের কাশির মত বাজিতে লাগিল। উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া সে মায়ের অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই মার কাছে যাইবে মনস্থ করিল।

পরে যখন সে মায়ের কাছে গেল, তখন সুনন্দা পঙ্খের কাজ করা মেঝেতে বসিয়া কয়েকটি পরিচিত অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়াছিলেন। দুই একটি স্ত্রীলোক সম্পর্কে মাসি, পিসি, বৌদি স্থানীয়া। অজিতকে কুশলবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের বাড়ী যায় না বলিয়া অভিযোগ তুলিয়া, এবং কালই রবিবার আছে তাহাদের

বাড়ী যাওয়ার সুবিধা, এ সব দেখাইয়া চুপ করিলেন। অজিত যথাসম্ভব তাহাদের মন রক্ষার উপযোগী উত্তর দিয়া মার দিকে চাহিয়া বলিল, আমাকে ডাকছিলে মা!

হ্যাঁরে—এই দু' একটি কথা ছিল, তা কাল সকালে বলব'খন। এখন ওদের সঙ্গে কথা বলছি, কালে ভদ্রে আসে। কেউ তো আর পর নয়। যাওয়া আসাতেই কুটুম্বিতা, তা খোকা, তোর কি বড় তাড়া আছে?

কথা শেষ করিয়া সুনন্দা চক্ষের পলক ফিরাইবার অবসর পাইলেন না। অজিতের সমস্ত মুখ লজ্জার তেজে রক্তাভ হইয়া উঠিল। এত লোকের সুমুখে, তাও স্ত্রীলোকের সমক্ষে তাহাকে খোকা বলার মধ্যে যে, কত বৃহতী লজ্জার কারণ লুক্কায়িত আছে তাহা মা বুঝিতে পারেন নাই। হ্যাঁ, খুব বিশেষ দরকার আছে, বলিয়া অজিত নিমেষের মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নীচে আসিয়া কোচম্যানের উপর দ্রুত গাড়ী হাঁকাইবার জন্য কড়া আদেশ দিয়া ডগ্ সিটে পা মেলিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অজিত আর কোন আপত্তি করিল না। কেননা দেবব্রত যখন কোন আপত্তি করে না, চাঁদকে বিবাহ করিতে মুক্তপাণি, তখন সে কেন নিজকে চাঁদের শত্রু বানাইয়া তুলে। চাঁদ তাহাদের আশ্রিতা অরক্ষণীয়া বলিয়া, চাঁদের সুখ সুবিধার জন্য তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে উদার হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। এই ভাবিয়া, চাঁদকে ডাকিয়া কিছুক্ষণ খোসগল্প করিয়া সে চাঁদ সম্বন্ধে অনেক বিরক্তির কারণ দূর করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

১০

পরদিন সন্ধ্যায় প্রতিশ্রুত নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য অজিত মঞ্জুলার বাড়ী উপস্থিত হইল। পরেশনাথের মন্দিরের সুমুখে ছোট রাস্তার পরে মঞ্জুলার বাড়ী। মাঝারি রকমের একটা দোতলা বাড়ী, এক অংশে সে একা বাস করে। দোতলার সিঁড়ি পার হইলেই ছোট একটি উঠান। তার মাথায় একটি সুসজ্জিত কক্ষে মঞ্জুলা, অজিতকে নিয়া বসাইল। গৃহ মধ্যে পালঙ্ক, দেয়ালগিরি, ড্রেসিং টেবিল, বুককেশ ইত্যাদি মনোজ্ঞ রুচির পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়; যেন মনে হয় মঞ্জুলা সে রকম ধনী না হইলেও বেশ গুছানো। মঞ্জুলা অজিতকে একখানি স্প্রীংয়ের চেয়ারে বসাইয়া বলিল, জানো আজ আমার সব আয়োজন মাটি করে দিয়েছে। কলেজের কয়েকটি মেয়ে আসবে বলেছিল, কিন্তু আজ শুনলেম, ওদের মেস খালি করতে হবে বলে সব বাড়ী চলে গেছে। তা' এখন কি করি বল দেকিনি!

অজিত শুধু জিজ্ঞাসা করিল, তা' হলে কেউ আসবে না?

তা' ওরা আর কেমন করে আসবে বল না, তবে তোমার জন্যই আমার চিন্তা, ওদের আসা না আসাতে আমার তত আসে যায় না। তুমি যে এসেছ তাতেই আমার সব এসেছে। বোস একটু, আমি তোমাকে চা এনে দিচ্ছি। ঝি তো মোটে একটি আসে, কাজ করে চলে যায়, রান্না বান্নার জন্য একটা বামণী রেখেছিলুম। তা'ও আজ ক'দিন ধরে কামাই মেরে আস্‌ছে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমায় নিজ হাতে খাওয়াতে পাব। কিছু মনে করবে না তো? আমি তা' হলে আসি।

অজিত একটু সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিল, তা এসো না, আমি তো এখানে বসতেই এসেছি।

আর খেতে আস নি?—বলিয়া মঞ্জুলা ভ্রুকুটির মধ্য দিয়া এক ঝলক হাসি বিছাইয়া বাহির হইয়া গেল। অজিতের সুমুখ হইতে যেন একটা ঘুমন্ত রাজপুরীর মায়াদ্বার উন্মোচিত হইয়া গেল। মঞ্জুলাকে সে এতদিন পড়াইত, এতদিন শুধু বাহিরের খোলসটা লইয়া নাড়াচাড়া করিত; এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে এমন পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে চরিত্রটি কোন দিন তাহার নজরে পড়ে নাই। মঞ্জুলা গরীব। কিন্তু তার অর্থবলের চেয়ে আদর আপ্যায়নের বল অনেক বেশী; এবং অজিত অল্পক্ষণেই যেন মঞ্জুলার অন্তরের একটী কোমল কক্ষের সন্ধান পাইয়া অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি অনুভব করিল।

কয়েক মিনিট পরে একখানি রেকাবীতে কাটা ফল, সন্দেশ ও এক গ্লাস্ ঘোলের সরবৎ আনিয়া অজিতের সম্মুখে টিপয়ে রাখিয়া বলিল, ভাবলুম চা দিই, কিন্তু আজ খুব গরম পড়েছে না? তাই এই সরবৎটুকু বানিয়ে এনেছি।

বেশ হয়েছে, তবে এত তো আমি খেতে পাবব না,—বলিয়া অজিত খাবারে হাত দিল। কিন্তু মঞ্জুলা কহিল, দাঁড়াও আমি ফলটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। বলিয়া সে লিচুর খোসা ছাড়াইয়া অজিতের হাতে তুলিয়া দিল। অজিত যৎসামান্য খাইয়া হাত গুটায় দেখিয়া, মঞ্জুলা পীড়াপীড়ি করিয়া বলিল, একটিও ফেলে রাখতে পারবে না বলছি!

অজিতের নিষেধ সত্ত্বেও,সে সন্দেশ ক'টি তাহাকে খাওয়াইয়া সরবতের গ্লাস্টা অজিতের হাতে তুলিয়া দিল। আহা দাঁড়াও,—বলিয়া পাখার রেগুলেটারটা শেষ মাথায় আনিয়া বলিল,—বড্ড গরম, বাতাস লাগছেই না মনে হচ্ছিল। এখন, কেমন ভাল লাগছে তো?

হাঁ, বলিয়া অজিত অল্প অল্প করিয়া সরবৎ পান করিতে লাগিল। মঞ্জুলা টিপয় পরিষ্কার করিল, পানের কৌটা ও একটিন সিগারেট রাখিয়া বলিল, তোমার গাড়ী নিয়ে আস নি ? একটু হাওয়া খেয়ে এসে, পরে খাওয়া দাওয়া করলে ভাল হয় না ?

সে অনেক রাত হয়ে যাবে না ?

তা' হোলোই বা, আমার এখানে কি জলে প'ড়েছ ? হ্যাঁ, দেখ, অনেক দিন থেকেই ভাবছি, তুমি আমার মাষ্টার হয়েছ বলে সুবিধা পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাকে কি বলে ডাকব ?—বলিয়াই সে অজিতের সুমুখের কোচটাতে বসিয়া পড়িল।

তোমার যা খুসী বলে ডাকতে পারো, বলিয়া অজিত সরবৎ মুখে দিল।

হাজার হোক তুমি আমার গুরুজন তো ? অজিত বলে ডাকতে কেমন যেন আটকাচ্ছে। না না সে পারব না, যাকগে কিছুই ডাকব না। অনেকে তো ওগো হ্যাঁগো দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়। কি বল, তাই হোক, তা' হলে চল, সবে তো আটটা বেজেছে, ঘণ্টা দুয়েক বেড়ানো যাবে। দাও দাও গ্লাসটা আমি বাইরে রেখে আসি।

বলিতে বলিতে গ্লাসটা লইয়া মঞ্জুলা বাহির হইয়া গেল। সিগারেট ধরাইয়া অজিত কেবলি মঞ্জুলার স্নেহমণ্ডিত হস্ত দু'খানির মাধুর্য্য কল্পনা করিয়া, এই সরলা, আড়ম্বর গর্ব্বহীনা অসহায়ার একান্ত একাকীত্বের প্রতি ক্ষীণ সকরুণ সহানুভূতি উপলব্ধি করিল। সঙ্গে সঙ্গে মীনার কথা মনে হইয়া মঞ্জুলার সহিত তুলনা করিয়া ভারী খুসী হইয়া উঠিল। মীনা তাহাকে ভালবাসিত, এবং সে ভালবাসা পাইয়া গর্ব্ব করা চলে সত্য, কিন্তু মঞ্জুলার ভালবাসার মধ্যে এমন একটি আত্মস্থ, পরম আত্মীয়তার স্পর্শ পাওয়া যায়, যাহার নিরলঙ্কার সৌম্য কান্তি প্রবাসীকে গৃহাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া

থাকে। মীনা যেন দূর নীল নির্ম্মল আকাশের কোলে চাঁদিমার সৌন্দর্য্যে মহিমময়ী, তাহার আলো-প্লাবনে সারা দেহমন অন্ধকার কুটীরের বন্ধন ত্যাগ করিতে প্রেরণা দেয়; ইহাতে কল্পনা আছে, তৃষ্ণা আছে, কামনার অতৃপ্ত বিলাস আছে, কিন্তু অপর পক্ষে মঞ্জুলার স্নেহব্যগ্র চিত্ত যেন গৃহ-কোণের ক্ষীণ দীপালোক, আলো আছে কিন্তু তাহা নির্ব্বাণের অপেক্ষা রাখে, আত্মদান করিবার মহনীয় আকাঙ্ক্ষায় তাহার শিক্ষা একান্ত নিবিড়, তাহার ক্ষুদ্র অবয়বে যতটুকু প্রতিভা আছে তাহা আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে সম্পূর্ণ। মীনাকে শুধু দেখিয়াই তৃপ্তি, নিঃশ্বাস লইয়া তৃপ্তি, তাহার নয়নানন্দকর দীপ্তি মনটাকে বিরাট জীবনের ক্ষেত্রে আনিয়া ভূমার আনন্দ দেয়, নিরাকার অনুভূতির স্বপ্ন জাগায়; কিন্তু মঞ্জুলাকে হাতের কাছে পাইতে যেন এক মুহূর্ত্তও অবসিত হয় না, তাহাকে আপনার ইচ্ছামত সজ্জায় বিভূষিত করিয়া তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহাকে দেখিবামাত্র, যেন দুটি অন্তরঙ্গ কথা বলিয়া চিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার সুযোগ আছে, আর এই মূর্ত্তিটিই যেন মানুষের একমাত্র কাম্য।

আরো কতক্ষণ সে এই ভাবে চিন্তা করিত তাহা বলা যায় না। তবে মঞ্জুলা আসিয়া তাহাকে বাহির হইবার জন্যে তাড়া দিবামাত্র, সে যাদু-মুগ্ধের ন্যায় গিয়া গাড়ীতে উঠিল। মঞ্জুলা তাহার সুমুখের সীটে বসিবা-মাত্র গাড়ী চলিতে লাগিল। কলকোলাহল মুখরা কলিকাতার জনবহুল রাস্তা ছাড়াইয়া গাড়ী ক্রমেই নির্জ্জন নিরালা নগরীপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রিন্সেপ্ ঘাটের সন্নিকটে অজিত মঞ্জুলাকে নামিতে বলিল। দুই জনে ঝক্‌ঝকে পীচের রাস্তার পার্শ্বে রেল লাইন পার হইয়া গঙ্গার পারে ঘন সন্নিবিষ্ট অশ্বত্থ গাছের নীচে গিয়া বসিল। ছোট লোহার বেঞ্চি, তীরের

গা ঘেঁষিয়া শস্পাস্তীর্ণ কোমল জমিতে অবস্থিত। দুই জনে পাশাপাশি বসিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৃদু মন্দ পবনসঞ্চালিত পুলিনশালিনী গঙ্গার ঢেউয়ের বুকে আলোকমালার নৃত্য দেখিল, ওপারে কলকারখানার অবিচ্ছেদ আলোকপুঞ্জ ক্ষণে ক্ষণে নির্ব্বাপিত হইয়া আবার জ্বলিয়া উঠে, উপরে লক্ষ তারার দীপাবলী ঝিকিমিকি করে, জ্যোৎস্নাঝরা রাত্রির সাধনা নিবিড় করিয়া জলস্নাত মন্দানিল মনখানিকে বহু দূর দূরান্তের স্বপ্নে বিহ্বল করিয়া রাখে। কোলাহলপঙ্কিল কলিকাতার বক্ষ ত্যাগ করিয়া এই মনোরম জাহ্নবীতীরে রাত্রির স্নেহলাভ করা কী সুন্দর, কী পুলকের! এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকল মানসিক তরঙ্গ শান্ত হইয়া আসে, অতীতের ক্লেদময় শ্রান্তি প্রভাতের কুয়াসার মত আত্মগোপন করে।

মঞ্জুলা অজিতের নীরবতা ভঙ্গ না করিয়া, রাত্রির এই আনন্দমূর্ত্তি কিছুক্ষণ দর্শন করিয়া, ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ কাঁপাইয়া বলিল, ইচ্ছে হয়, কোলকাতা ছেড়ে সমুদ্রপথে বেড়িয়ে আসি। চল, দু'জনে মিলে রেঙ্গুন থেকে ঘুরে আসি। বড় আনন্দ হয় কিন্তু; চারিদিকে পাহাড়ের মত ঢেউ এসে আমাদের দুলিয়ে যাবে, আর আমরা দু'জনে সেই ভীষণ দৃশ্যের ভয়টা একান্ত উৎকণ্ঠাহীন ভাবে কাটিয়ে দিয়ে অন্য দ্বীপে চলে যাব।

মঞ্জুলা এমন ভাবে কথাটা শেষ করিল, যেন সে সত্যই বীচিবিক্ষুব্ধ বিশাল সমুদ্র কখনো দেখিয়াছে! অজিত তাহার মুখের দিকে কৌতুক-ভরা দুই মুদিত চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি সমুদ্র দেখেছো?

না, তা' দেখিনি, তবে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনা করি, রাতের পর রাত আকাশের গায়ে পুঞ্জ মেঘ দেখে সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। মনখানি ক্ষুদ্র নীড় ছেড়ে যেন কোন এক অস্পষ্ট মায়ালোকের সন্ধানে ধেয়ে যায়। আমি যে তখন আমার নিঃসঙ্গ

জীবনটাকে কত অসহায় বুঝতে পারি তা' আর কি বলব। জানো, সংসারে মনের কথা বলবার মত যার মানুষ নেই তার সংসার অরণ্য অপেক্ষা কঠিন।

বলিতে বলিতে সে তাহার দুই বিশাল চক্ষু দিয়া যেন অজিতকে গিলিয়া ফেলিতেছিল। অজিত তাহার কাল কাল বড় চক্ষুর দিকে চাহিয়া, নিমেষে দৃষ্টি ফিরাইয়া লীলায়িত গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল। একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস মঞ্জুলার বুক হইতে সমস্ত গুমোট ভাব টানিয়া বাহির হইয়া আসিল।

অজিত উত্তর দিল, একথা সত্যি মঞ্জু, মনের ভেতর নানা কল্পনা সুখ দুঃখের আঘাতে জেগে উঠে। তা'কে হালকা করার জন্যে একটা আশ্রয় চাই বৈ কি? তবে মনের মানুষ চাওয়াটা যেমন স্বাভাবিক, পাওয়াটা তত সুগম নয়। মানুষকে চিনতে পারা কি এতই সহজ মঞ্জু?

এক পক্ষে খুবই সহজ আবার দুরূহও বটে। তবে আমার মনে হয়, যাকে দেখলেই মন আমার, তার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই তো সত্যিকার মনের মানুষ।

তোমার কি এমন দর্শন হয়েছে মঞ্জু! বলিয়া অজিত একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া দেখিল, মঞ্জুলার মুখখানি অকস্মাৎ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

মঞ্জুলা নতশিরে বসিয়া হাতের রুমালটা পাকাইতেছিল। সে অভি-ভূতের ন্যায় মাথা তুলিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, সে একদিন জানতে পারবে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। অজিত পা হইতে জুতা খুলিয়া সুখাসনে বসিয়াছিল। সে একটা চুরুট ধরাইয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম অনর্গলভাবে ছাড়িয়া দিল। মঞ্জুলা যেন কি একটা প্রশ্ন করিবার জন্যে এতক্ষণ আকুলি-

বিকুলি করিতেছিল। সে একটা কাশি দিয়া মনের জড়তা দূর করিয়া কহিল, আচ্ছা, মানুষের কল্পনা কি সত্য হয় ?

প্রশ্নটা এমনি অবান্তর অথচ সার্ব্বজনীন যে, ইচ্ছা থাকিলেও অজিত এ কথার উত্তর দিতে গিয়া কেমন স্বার্থের চেতনায় ঘা খাইল। সে নীরবে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মঞ্জুলা অজিতের এই অসহায় মুহূর্ত্ত হইতে তাহাকে নির্মুক্ত করিয়া বলিল, চল বাড়ী ফেরা যাক, বাজে ব'কে লাভ নেই, রাত বোধ হয় সাড়ে দশটা হবে।

সে আপন ঘড়ির দিকে তাকাইয়া, অজিতকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। মঞ্জুলার বাড়ীখানি নীরব নিদ্রামগ্ন। অজিতকে ঘরে বসাইয়া নীচে গিয়া খাওয়ার আয়োজন করিল। সমস্তই রান্না করা ছিল। শুধু ষ্টোভ জ্বালিয়া লুচি ভাজিয়া অজিতকে নামাইয়া দিবে।

আহার শেষ হইতে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যয়িত হইল। অজিতকে পান সিগারেট দিয়া মঞ্জুলা কাপড় ছাড়িয়া বলিল, তুমি কি আজ আবার বাড়ী যেতে চাও নাকি ? এগারোটার উপর রাত হয়েছে। আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে, এ সময় আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারিনে।

সে কি হয়, মা ভয়ানক ভাববেন যে ! রাত্তিরে থাকলে চলে না মঞ্জু, বরং আর একদিন আসা যাবে। কোচম্যানের খাওয়া হয়নি, ঘোড়া দু'টোর ভয়ানক খাটুনি হয়েছে, ওরা হয় তো আমার জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠছে। আজকে আমি আসি।

বলিয়াই অজিত দাঁড়াইল। মঞ্জুলা অধরপ্রান্তে একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি ওদেরকে আগেই বিদেয় করে দিয়েছি। আমি জানি যে, তোমার যাওয়া হবে না।

কেন ! অজিতের আশ্চর্য্য কম্পিত অধরে ইহার অধিক কথা বাহির

হইল না। মঞ্জুলা তাহাকে বসাইয়া নম্র স্বরে বলিল, এখানে তো আর কেউ তোমাকে মারছে না যে, যাওয়ার জন্যে এত উতলা হয়েছ!

মঞ্জুলাকে আর কথা বলিতে না দিয়া অজিত পুনরায় উঠিয়া একেবারে দরজার চৌকাঠ পার হইয়া সিঁড়িতে পা দিয়া বলিল, আজ থাক মঞ্জু, আর একদিন আসবো'খন।

তাহার স্বর ক্রমশঃ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছিল। মঞ্জুলার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। রেলিঙ্ ঝুঁকিয়া নীচের দিকে গলা বাড়াইয়া বলিল, আচ্ছা।

কোন প্রতিধ্বনি তাহার গদ্‌গদ কণ্ঠের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই।

১১

মঞ্জুলার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসার মধ্যে অজিতের যে টুকু লৌকিকতার কার্পণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার জন্যে সে নিজেকে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন মোটেই মনে করে নাই। কেন না, সে ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, মঞ্জুলার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করার মধ্যে কোন আবশ্যকতা আছে। ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। কোন দিন ভ্রমক্রমেও যে নাকি বাড়ী ছাড়িয়া থাকে না, তাহার পক্ষে হঠাৎ একটা নিমন্ত্রণের অছিলায় অপর বাড়ীতে থাকা একটু বিচারসাপেক্ষ।

অথচ যে জিনিষটা সে মানসচক্ষে কদাপি দেখে নাই, সে ব্যাপার সাধনের জন্যে মঞ্জুলা কি না করিয়াছে! যত্ন আত্তি, আদর অভ্যর্থনা, এমন কি, তাহার প্রতি অগাধ বিশ্বাসবশতঃ গাড়ীখানা ফিরাইয়া দিতেও সে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অজিত বাড়ীতে বসিয়া এই নূতন অভিজ্ঞতাটিকে বিশ্লেষণ কবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল।

এদিকে প্রায় দশদিন অতীতপ্রায়। তবু মঞ্জুলা তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। চাঁদকে পড়াইতেও না, নিজের পড়া দিতে তো নয়ই। অজিত প্রথম কয়েক দিন মনে করিয়াছিল, বোধ হয় কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে। কিন্তু পর পব দশটা দিন যে, এমন ভাবে কাটিয়া যায়, তাহাতে অজিত যেন মনের সুগোপন কোমল পর্দ্দায একটু আঘাত অনুভব করিল। যতই সে মঞ্জুলার বন্ধুত্বটা নিষ্ক্রিয ভাবে এড়াইয়া যাইবে ভাবিয়াছিল, ততই যেন অপর পক্ষের অনুপস্থিতিটা তাহাকে হারানো মৃগের ন্যায কেবলি ঐ স্নেহসুন্দরী পরম যত্নপরায়ণা মঞ্জুলার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। এখন

যেন তাহার সেই রাত্রির প্রত্যাখ্যান, অবহেলা অবজ্ঞার পরিচয়টা ক্রমশঃ মনের কোণে বসিয়া খাল কাটিয়া যাইতেছে।

এমনি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় তাহার রাত্রি কাটিল। অন্ধ তমোময়ী রাত্রি তাহার কাছে মঞ্জুলার অপরিসীম সৌন্দর্য্যের স্মৃতিটা সারা চোখে মনের উপর আলিপনা কাটিয়া প্রভাতের কোলে মিলাইয়া গেল। একটা অস্বস্তি একটু অনুতাপ, একটি কোমল বেদনার রেখা তাহাকে ক্রমশঃ ব্যাকুল করিল।

সকালে চা খাইয়া, সে একটা সাংসারিক কাজে কাছারি ঘরে বসিয়া সরকারের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় যোগেশ একখানা খামে বন্ধ চিঠি আনিয়া তাহার কাছে দিয়া গেল। অজিত খাম ছিঁড়িয়া দেখিল, চিঠি দিয়াছে মীনা।

মীনা সিমলা হইতে লিখিয়াছে ;—অজিতদা, তুমি বোধ হয় জান যে, আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি। লক্ষ্ণৌ থেকে যে পত্র দিই, তা নিশ্চয় পেয়ে থাকবে। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেম। আমরা ক'দিন হ'ল শিমলেয় এসেছি। এখানে এসে বড় ভাল লাগছে। মা, বাবা তোমার কথা রোজই বলেন। তোমার সময় থাকলে এদিকে এসে বেড়িয়ে যেও। আমরা মাস খানেক বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরে আসব।

নিমুদা আমাদের সঙ্গেই আছেন। নিমুদা বেশ লোক। বাবা ওঁকে খুব ভালবাসেন। আমাকে অনেক নতুন গান শিখিয়েছেন। একখানা নতুন উপন্যাস লিখেছেন। তুমি এলে দেখতে পাবে। বইটি খুব ভাল লেগেছে। নিমুদা কিন্তু নিশ্চয়ই শাইন করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অজিত পত্রখানি কয়েকবারই পড়িয়া ফেলিল। উদ্দেশ্য,—তাহাকে যাওয়ার কথা যেখানে লিখিয়াছে, তাহা কতটুকু আন্তরিকতায় ভরা—

তা'ই পরীক্ষা করিবে। কিন্তু ওজন করিয়া সে বিফলমনোরথ হইল। তাহার আবশ্যকতা যেন নির্ম্মলের উপস্থিতিতে কতকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। নির্ম্মল সম্মুখে থাকা পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রয়োজন মীনার কাছে তত অন্তরঙ্গ হইবে না। কিন্তু এমনইবা কেন হইবে? মীনা কি নির্ম্মলকে তাহার সঙ্গে সমানাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে?

ভাবিয়া অজিতের আত্মম্ভরিতা তাহাকে একটা ভূমিকম্পের মত সজাগ করিয়া তুলিল। তাহার সঙ্গে নির্ম্মলের তুলনা,—ভাবিতে গেলেও ধিক্কারের চাবুক আসিয়া সর্ব্বদিক হইতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। সামান্য কয়েক দিনের ব্যবধান বৈ তো নয়। এরই মধ্যে মীনা কি নিমুকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? কিছুতেই সে এই অসহ্য দৃশ্যটা বরদাস্ত করিবেনা। মীনা তাহার মানসসরোবরে একমাত্র মরালী-স্বরূপ। তাহার লীলাবিলাস, তাহার পক্ষ সঞ্চালন, তাহার গ্রীবা-ভঙ্গী অজিতের একমাত্র স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এই একান্ত মোহন আভিজাত্যটি কোন কারণে কেন্দ্রচ্যুত হইবে,—একথা কিছুতেই অজিত স্বীকার করিতে পারে না। তাহার স্বার্থের বুকে আঘাত অনুভব করিয়া অজিতের রক্তস্রোত দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল।

এই উত্তেজনা, এই উন্মাদনা, স্বার্থ রক্ষার এই অব্যর্থ দৃষ্টি, ইহাই বোধ হয় ভালবাসারও সঞ্জীবনী! ভালবাসা আবহমান কাল বাঁচিয়া থাকে, শুধু এই স্বার্থ-রক্ষার সত্য অনুভূতি দ্বারা। চাওয়া ও পাওয়ার যোগ-সাধনা যেখানে অব্যর্থ সেখানে ভালবাসাও চিরন্তনী। অজিত যেন আতপে দগ্ধ হইবার ভয়ে, উঠিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া, তাহার চেয়ে দ্বিগুণ বড় ছায়া ফেলিয়া হাঁটিয়া মঞ্জুলার বাড়ী গিয়া হাজির হইল।

উপরে বসিয়া মঞ্জুলা কি একটা সেলাই করিতেছিল। অজিতকে

দেখিয়াই সে সোল্লাসে উঠিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া যোগ করিল,— আমার পরম সৌভাগ্য যে, মহম্মদ নিজেই এসে হাজির হয়েছে। তার পরে বলছি, এই একটা অসুখ থেকে উঠ্‌লাম কি একটি বার দেখে যেতে নেই? কেমন আছ? মা, চাঁদ এরা সব ভাল আছেন?

অজিত বসিবার আগেই মঞ্জুলা একটা সিগারেট তাহার হাতে দিয়া কহিল, আমি দেখ্‌ছি মানুষের কামনা ব্যর্থ হয় না। সে রাত্তিরে তুমি যেমন আমায় অপরাধিনী করে গেলে, তা'তে ভরসা হয়নি যে, তোমায় ডাকিয়ে আনি। কিন্তু না ডেকে যে কষ্ট পেয়েছি তার জন্যেই বোধ হয় বিধাতা সদয় হয়েছেন।

বলিয়াই মঞ্জুলা বাহিরে রেলিঙ্‌ ঝুঁকিয়া বলিল, নটু, এক কাপ চা দিয়ে যাও তো!

ফিরিয়া আসিয়া মঞ্জুলা, অজিতের সুমুখের বড় কোচটাতে বসিয়া পড়িল। অজিত যে কারণে এখানে আসিয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল! তাহার বক্তব্য ছিল যে, সে মঞ্জুলাকে বলিয়া যাইবে,—সে শিমলা যাইতেছে। কিন্তু এমন ভাবে মঞ্জুলা তাহার চিত্তে মাধুর্য্য বিছাইয়া দিল যে, সে এমন গন্ধময় কথাটা না বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, চল, মঞ্জু শিমলে থেকে বেড়িয়ে আসি. এ সময়টা সেখানে বেশ ভাল লাগবে। তুমি যাবে?

মঞ্জুলা নিশ্চিন্তমনে উত্তর দিল, কেন যাবনা! তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যেতে আমার আপত্তি কি! কবে যেতে হবে?

অজিত সিগারেটের ধূমটা ছাড়িয়া বলিল, কালই পাঞ্জাব মেল ধরি, কি বল! প্রস্তুত থাকবে তো?

তা থাকব, কিন্তু কাল সকালের দিকে একটিবার তোমার আসতে

হবে। আমার যে সব গরম কাপড় আছে তা নিয়ে কোথাও বাইরে যাওয়া চলে না। আমি কতগুলো জামা কিনে নেব, তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।—বলিয়া মঞ্জুলা অজিতের জন্যে আনীত চা দিয়া কহিল, আজ কি আর তুমি বেরোবে?

না আজ আর আমি কোথাও যাব না, এখন বাড়ীর দিকে যাই একবার। বলিয়া, অজিত চায়ের শেষ চুমুক দিয়া, যাওয়ার জন্যে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জুলা তাহাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া ফিরিয়া গেল। অজিত হালকা মনে বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। একটা নতুন কল্পনা তাহার মনের তরীটিকে পালের নৌকার মতন উড়াইয়া লইয়া চলিল। মীনার পত্র পাইয়া এতক্ষণ তাহার মন যে ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যে, সে মঞ্জুলাকে লইয়া সিমলা পর্য্যন্ত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। মীনা যেরূপ নির্ম্মলকে পাইয়া তাহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে, সেইরূপ সে ও যে মঞ্জুলাকে ভর করিয়া মীনার ঐ উদাসীনতার প্রত্যুত্তর দিতে পারে, ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। বিষে নাকি বিষ ক্ষয় হয়। তাই সে মঞ্জুলার সাহায্য এত আকাঙ্ক্ষিত মনে করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া লইল।

পরদিন একতাড়া নোট লইয়া সে মঞ্জুলার পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া দিবার সময় বলিল, মঞ্জু, তোমার কোন কিছুর আবশ্যক হলে আমায় বলবে।

কথাটা লুফিয়া লইয়া মঞ্জুলা উত্তর দিল, নিশ্চয়ই। আমার আর কে আছে বল তো? যখন তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল না, তখন মনে হত আমার মত দুঃখী বুঝি ত্রিসংসারে নেই; কিন্তু ভগবান তোমায়

পাঠিয়েছেন তাই মনে জোর পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন আমার কোন কিছুরই অভাব নেই।

এইভাবে তাহাদের জিনিষ পত্র ক্রয়ের পালা ফুরাইল। সন্ধ্যার দিকে তাহারা সিমলা যাত্রা করিল,—সঙ্গে গেল মঞ্জুলার চাকর নটু।

পরদিন অজিত শিমলায় মীনাদের বাড়ীর মধ্যে পা দিবার পূর্ব্বেই মঞ্জুলাকে চিনিতে পারিয়াছিল। মঞ্জুলা যে শুধু মিষ্ট্রেস্ নয়, তার মধ্যে একটি যুবতীর সুপ্ত চিত্ত দুই বাহু মেলিয়া বহুদিন ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই অনুভূতিটা যেন নবোদিত চন্দ্রমার মত তাহার মানসপটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমগ্র চেতনা দিয়া মঞ্জুলা যে, তাহাকে প্রেমে ভালবাসায়, স্নেহে মমতায় আঁকড়াইয়া ধরিতে চায় তাহা মঞ্জুলার আচরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

অজিত মীনাদের বাড়ীতে না উঠিয়া মঞ্জুলাকে লইয়া ভিন্ন বাড়ী ভাড়া করিল। নূতন বাড়ী, নূতন মানুষের সঙ্গে গৃহপত্তন—অজিতের যেন চির স্বাধীন মন একটু স্নেহালয়ের সন্ধান পাইয়া কিসের অভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল। সকাল বেলার দিকে মঞ্জুলা চাকর সঙ্গে লইয়া অজিতের চা দিতে আসামাত্র, অজিত তাহাকে বসিতে বলিল।

মঞ্জুলা প্রত্যুত্তরে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সিগারেটের কৌটা লইয়া ফিরিয়া আসন পরিগ্রহ করিল। অজিত কথাপ্রসঙ্গে বলিল, তুমি মীনাদের বাড়ী যাবে ?

না আমার গিয়ে কাজ নেই। বরং ওকে এখানে নিয়ে এস। আমি বিকেলের দিকে তার অভ্যর্থনার আয়োজন করে রাখব। সে বড়লোকের মেয়ে।—একটা চাপা দুঃখের বাষ্প তাহার কথার মধ্য দিয়া স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল।

অজিতের কাছে মঞ্জুলার দারিদ্র্যের বিক্ষোভ অজ্ঞাত রহিল না। সে মঞ্জুলার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, তুমি কি আর গরীব মঞ্জু, তোমার অভাব কিসের,—

মঞ্জুলার প্রোজ্জ্বল চক্ষুর কোল দিয়া কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু কপোলতল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ তাহা রুমাল চাপা দিয়া, অজিতের পায়ের ধূলি লইয়া কহিল, রাজা, তুমি আমার সহায় আছ। আর আমার দুঃখ নেই। টাকা পয়সা যার কাছে তুচ্ছ সে মানুষকে যখন পেয়েছি—

অবশিষ্ট কথা বলিবার পূর্ব্বে সোফেয়ার আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। অজিত উঠিয়া বলিল, মঞ্জু, তা' হলে আমি একটিবার মীনাদের সঙ্গে দেখা করে আসিগে।

অজিত চলিয়া গেল। মঞ্জুলা উঠিয়া অজিতের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহখানি গুছাইতে মনোযোগ দিল। কয়েকখানি ছবি প্রয়োজন মনে করিয়া, সে চাকরকে দিয়া আনাইয়া লইল। শেল্‌ফে পুস্তক, দেরাজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দেয়ালে ব্র্যাকেট—এই ভাবে কাজ সুরু করিয়া সে বিছানাটি পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া পুছিয়া ঝকঝকে করিয়া, একখানা বই লইয়া বিছানায় কখন যে শুইয়া পড়িল, তাহা সে টের পায় নাই। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য পাতলা কাল মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল। অজিত ঘরে আসিয়াই একটি এলায়িত জোছনার মতন মঞ্জুলাকে তাহার বিছানার পরে শায়িত দেখিয়া, সে বাহিরে বারান্দায় চাকরকে ডাকিয়া বলিল, অনেক বেলা হয়েছে যে! তোর মুনিবকে জাগিয়ে দে নটু!

মঞ্জুলা স্বপ্নভরা চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ মুছিয়া সুমুখেই অজিতকে দেখিয়া কহিল, তোমার চান হয়নি এখনো? জান,

স্বপ্ন দেখছিলাম ! কোন একটা জনহীন মাঠের মধ্য পথে আমরা দুজনে চলেছি, কোথা থেকে তা জানিনে। দুই পাশে সবুজ তৃণের গোছা আমাদের পায়ে এসে ঠেকছে। লোকালয় যে কত পেছনে পড়ল,—শুধু একটা কাল রেখার মত গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। সুমুখে যতদূর দেখি ধূঁয়া ধূঁয়া আকাশ, তার গায়ে মেঘের লীলাবিলাস,—যেন কে লাল নীল, কাল হরিৎ রঙের ওড়না ঢাকা দিয়ে দিকচক্রবালের অজানা পুরীতে যাত্রা করেছে। আমি হঠাৎ ভয়ে কেঁপে উঠে তোমার হাত ধরেছি, কিন্তু তুমি সেই অদৃশ্য রূপসীর পশ্চাতে ছুটে চলে গেলে, তখন আমি একা আর সঙ্গী আমার চোখের জল। অজিত, সত্যি কি এরূপ হবে ! স্বপ্ন কি ব্যর্থ হয় না ?

বলিতে বলিতে মঞ্জুলা, মুখ চাপা দিয়া কয়েক ফোঁটা বিগলিত মুক্তাধারা-স্রোতে উষ্ণ করুণার তাপ বহাইয়া দিল। অজিত তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, দূর পাগল, এ-তা স্বপ্ন, তুমি এত ভয় খাচ্ছ কেন ! তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর !

না না অবিশ্বাস নয়, আমার জীবনে আর কোন কামনা নেই অজিত,—একেকবার ভাবি কেমন করে মনের পাতা খুলে তোমাকে দেখাই—সেখানে কার নাম লেখা আছে ! দুর্ব্বল মন, সংসারে কোনদিন কারো স্নেহ পাইনি, আদর করে কেউ তোমার মতন সম্মান করেনি, তাই মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা আসে।

এই কথা বলিয়া, মঞ্জুলা হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, আমি অভাগা, তাই সংশয় এখনো সূর্য্যকিরণ ম্লান করতে চায়, দেবতা, আমায় ক্ষমা কর।

একটা প্রণাম করিয়া মঞ্জুলা অজিতের পায়ের ধূলা লইল। অজিত

বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল,—মঞ্জু, সত্য যদি এক হয় তবে ভালবাসাও একই আছে। নইলে তুমি আমার ছাত্রী হয়েও যেভাবে আমার দিন রাত্রির শূন্যতা ভরিয়ে রেখেছ তা'তে আমি সায় না দিয়ে পারছি কই! চল, ওবেলা মীনা আসবে, তার আহারাদির ব্যবস্থা আছে এর পরে।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা বাথরুমের দ্বারে আসিয়াছিল। মঞ্জুলা অজিতের কাপড় গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। অজিত স্নান করিতে করিতে মীনার সহিত মঞ্জুলাকে তুলনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। মঞ্জুলা চিরদুঃখিনী হইলেও তাহার মধ্যে, একটি সৌন্দর্য্য বনফুলের ন্যায় নীরবে ঝরার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, ভাবিয়া তাহার প্রতি করুণার ধারা জাগিয়া শতদিক হইতে তাহাকে আবেষ্টন করিয়া ধরিল। কিন্তু বাথরুম হইতে বাহির হইবার সময় ভাবিল, সে মঞ্জুলাকে লইয়া কি করিতে পারে! মীনার মা সুকুমারী, অনতিপূর্ব্বেও তাহার সঙ্গে মীনার বিবাহের আলাপ করিয়াছেন। এমন কি, নির্ম্মলের সহিত তাহার বিবাহ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াছেন, আরো এই কথাটা পাকাপাকী করিবার জন্যে বলিয়াছেন, আগামী মাসে কলকাতায় গিয়েই পাকা দেখার কাজটা শেষ করে নিতে হবে।

অজিত অবশ্য ইহার উত্তরে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দেয় নাই। কিন্তু মনে মনে সে জানিত, যদি এই বিবাহ হইয়া যায় তবেও তাহার বিরুদ্ধাচরণের শক্তি নাই। এমতাবস্থায় সে মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া যে আর্দ্র অনুভূতির স্বাদ পায়, ইহার ন্যায্য দাম দিতে পারিবে কি!

এই ভাবে দোলায়মান-চিত্তে তাহার সমস্ত দিন কাটিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরের অস্পষ্ট কুয়াসার ন্যায় ভাসমান হাল্কা চিন্তামালা তাহার মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। অবশেষে মীনা যখন নির্ম্মলকে লইয়া

তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সে এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ের সমস্ত চেতনা ঢালিয়া তাহাদিগকে আপনার করিবার জন্যে দৃঢ়সম্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। নির্ম্মলের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ, তাহার জ্ঞানের অজ্ঞাতসারে জাগিয়া উঠিয়া, মীনাকে ছিনাইয়া লইবার ক্রূর প্রচেষ্টাকারীর সমুচিত শাস্তি দিবার জন্যে মন হিংস্র হইয়া উঠিল। প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় উগ্র বিচীকির্ষার বেগ দমন করিয়া সে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার তদারক করিল।

মীনা ঘরে আসিয়া একেবারে অজিতের পার্শ্বে বসিয়া, তাহাদের ভ্রমণ-কাহিনীর বিস্তৃত ইতিহাস অনর্গল বলিয়া গেল। সে হয়তো আরো বলিত, কিন্তু মাঝখানে মঞ্জুলা আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া আরম্ভ করিল,—নমস্কার নির্ম্মল বাবু, আপনার কথা আমি অনেক দিন ওঁর মুখে শুনেছি। আপনি মীনাদেবীকে পড়ান, তাই এতো ভাল রেজাল্ট্ করিয়েছেন তাও জানি। এলেম আছে বটে আপনার। তা' এসোনা বোন আমার ঘরে একবার।—বলিয়াই সে মীনাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া, অজিতের দিকে চাহিয়া যাইবার সময় বলিল, এস, নির্ম্মল বাবুকে ও ঘরে নিয়ে এস।

তাহারা সকলে গিয়া গোলটেবিলে সভা পাকাইয়া বসিল। মঞ্জুলা চাকরের সঙ্গে চা, খাবারের রেকাবী সাজাইয়া দিতে লাগিল। মীনা চা খাইতে খাইতে বলিল, আজকাল বুঝি অজিতদা তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এক পাও নড়েন না, মঞ্জুলাদি!

মঞ্জুলা হাস্যস্ফুরিত অধরে উত্তর দিল, তা নয় বোন, যে মনভোলা লোক, না আছে খাওয়া শোওয়ার হিসাব, না আছে কাপড় জামার হিসাব। যেন এ সংসারছাড়া, তাই বিদেশে ছেড়ে দিতে ভরসা হোল না। তা' বোন, একলা আমাকে দোষী করে লাভ কি। আমাদের

মেয়েদেরও স্বভাব দেখো, পুরুষগুলো অকর্ম্মণ্য যত বেশী হয় আমরাও সে দিকে যেন চোখ না রেখে থাকতে পারি না। নির্ম্মলবাবু তো বোধ হয় আরো বেশী এলোমেলো,—সাহিত্যিক কি না!

সহজ শান্ত অথচ রহস্যের সাহায্যে গূঢ় অর্থসূচক কথা বলিয়া মঞ্জুলা ভাবিয়াছিল, মীনা এই কথাটা প্রাণ দিয়া উপভোগ করিয়া উত্তর দিবে। কিন্তু ঘটিয়া গেল অন্যমত। অপর পক্ষ অকস্মাৎ মেঘঘন আকাশের মত ভারী মুখ করিয়া অজিতের দিকে চাহিয়া, লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু ততোধিক ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রদাহদগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। মীনা চট্ করিয়া বলিল, কি বলছেন আপনি, সকলকেই আপনার মত ভাববেন না। থাকগে, অজিত দা, মানুষকে অপমান করার ইচ্ছা থাকলে, বাড়ীতে এনে করা নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ নয় কি? তোমার যদি এই মনে ছিল, তবে আমাকে আগে বললেই ভাল হত, ওঠ নিমুদা, আর এই অস্থানে এক দণ্ডও নয়! ওঠনা, এখানে বসে হাঁ করে কি দেখছ!

বলিয়া কম্পিত হস্তে নির্ম্মলকে টানিতে টানিতে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া, যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছিল তেমনি অলক্ষ্যে ফিরিয়া গেল।

বসিয়া বসিয়া অজিতের মাথা ঝিমঝিম করিয়া আসিতেছিল। সে এক দৌড়ে আপন কক্ষে গিয়া শিথিল দেহে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মঞ্জুলা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থলে দাঁড়াইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় উদাস অস্ফুট নয়নে চলা-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি ক্রমেই নির্জ্জন পথের উপর সুস্নিগ্ধ অঞ্চল বিছাইয়া সমস্ত দিনের চঞ্চলতা শান্ত করিয়া আনিতেছিল। মঞ্জুলা এক পা অগ্রসর হয় তো দুই পা পশ্চাতে সরিয়া আসে। এই ভাবে যখন সে অজিতের শয্যাপার্শ্বে

গিয়া উপবেশন করিল, তখন বাহিরে ঝাউ গাছের আড়াল হইতে একটা ভিজা বাতাস আসিয়া গৃহখানিতে বরফ ছড়াইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জানালাগুলি বন্ধ করিয়া অজিতকে জাগাইয়া তুলিল।

অজিত তেমনি গম্ভীর অধোবদনে মেঝের দিকে ধ্যান-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মঞ্জুলা তাহাকে খাওয়ার তাগিদ দিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। আহারের পর অজিত বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মঞ্জুলা না খাইয়া তাহার আপন কক্ষে গিয়া খিল দিয়াছে। মুহূর্ত্তে অজিতের মনখানি পরিতাপের ঢেউয়ে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। যাহাকে সে সঙ্গে আনিয়াছে, তাহার সুখ সুবিধার জন্যে সেই তো দায়ী! অজিত মঞ্জুলার দুয়ারে কড়া নাড়িয়া ভিতরে গিয়া, মঞ্জুলাকে আহারের জন্যে পীড়াপীড়ি করিতেই, মঞ্জুলা উত্তরে বলিল, আজ তোমাকে একটা কথা বলব তার উত্তর দেবে?

অজিত ম্লান-আঁখি মঞ্জুলার বিষণ্ণ-মুখের দিকে করুণ-নেত্রে তাকাইয়া বলিল, কি বলতে চাও, মীনার কথা!

মঞ্জুলা অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল, উঠিয়া অজিতের মুখোমুখী বসিয়া সু-উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়া যেন অজিতের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল। সে কিয়ৎক্ষণ মৌন মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় স্থির অচঞ্চল চক্ষে অজিতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীর সংযত কণ্ঠে বলিল,—মীনার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার ভাব আছে অজিত, এ লুকোবার চেষ্টা বৃথা হবে। তার উপর, তুমি শুধু তার কাছে তোমার আদর বাড়াতে আমাকে একটা তৃণের মত টেনে নিয়ে এসেছ। কিন্তু একটা কথা ভুলে গেছ যে, আমাকে অপমান করার কতটুকু অধিকার তুমি পেয়েছ! তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি অজিত, কিন্তু আমার এই শ্রদ্ধা যে, এমন নির্দ্দয় ভাবে অপমানিত হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

মঞ্জুলার আবেগসিক্ত কণ্ঠস্বরে অজিত হতভম্ব বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া লঘু স্বরে কহিল, তা নয় মঞ্জু, তোমার প্রতি অবিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

অবশিষ্ট কথা বলার পূর্ব্বেই মঞ্জুলার দুই চক্ষু অশ্রুজলে ঝাপ্সা হইয়া উঠিয়াছিল। সে উত্তেজিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া বলিল, না, যাও তুমি, তোমার দয়ার ভিখারী আমি হতে চাই না। যাও তুমি, আমাকে একলা থাকতে দাও। ওগো তোমার পায়ে পড়ি।

শিথিলদেহ মঞ্জুলা ভূলুণ্ঠিত লতার ন্যায় বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। অজিত যে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আপন ঘরে ফিরিয়া গেল।

অন্ধকার কুহেলীছায়া তখনো ম্লান হয় নাই। কুয়াসার ঘন ঊর্ণচক্র ভেদ করিয়া বিহঙ্গকূজন গুঞ্জিত হইতেছে। রাত্রির সহচরী শুকতারা সবেমাত্র বিদায় মাগিল। পাতলা ঘুমের আবেশ ক্রমশঃ অপহৃত হইয়া অজিতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আধ আলো আধ অন্ধকারে আচ্ছন্নতার মাঝে অজিত অধোবদনে পা টিপিয়া কবাট খুলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

ঊষার অরুণস্নাত পূর্ব্বাঞ্চলে সবিতাবৈভব ফুটিয়াছে। অজিত তাহার মনের অসহ্য গ্লানি নিবারণ করিবার জন্য, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অস্পষ্ট স্বপ্নকথার মতন তাহার মনে পড়িল,—যখন কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনে ভ্রমণকালে, মঞ্জুলা তাহাকে বিবাহের কথায় সম্মত করিতে চাহিয়াছিল, তখন সে ঐ কুসুমকোমলা যুবতীকে কত সান্ত্বনা দিয়াছে। কত সুখ সম্ভোগের রঙ্গীন কল্পনা ব্যক্ত করিয়াছে, অবশেষে বলিয়াছে, মঞ্জু, হৃদয় যখন দেউলে হয়ে যায় তখন অনেকে বলে, দেহের মূলধন ভাঙ্গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা কি সত্য, এই মিলনের কি তবে কোনই গৌরব নাই ?

মঞ্জুলা তাহা কাটাইয়া বলিয়াছে, কারা বলে ? পুরুষরাই এই কথা বলে নিজেদের দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়। পুরুষ অত্যন্ত আদর্শবাদী, বাস্তব-জগতের ঘাতপ্রতিঘাত মাথার পরে অবিশ্রান্ত ঝরে গেলেও কিছুতেই দেহের অলঙ্ঘ্য নিয়মকে আসন দেবে না। কিন্তু পুরুষ এখানে ভুলে যায় যে, দেহের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যেই হৃদয়ের অনুভূতির পরম পরিণতি লাভ করে।

কিছুক্ষণ নীরব হিমেল শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তার পরে মঞ্জুলা পুনরায় বলিয়াছে, তা যা হোক, তোমাকে আমি বলছি না যে, তুমি আদর্শ ত্যাগ কর। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা আদর্শপ্রাণ বলেই তোমাদের উপর লোকের সন্দেহ আসে। আজ তুমি আমার কাছে যেমন প্রাণ খুলে কথা বলছ, এমন সময় হয়তো আসতে পারে যখন তুমি আর আমার মুখ দর্শন করবে না।

অজিত কিন্তু কথাটার উত্তরে নিছক জিদ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ প্রভাতের ঔজ্জ্বল্য যত বৃদ্ধি পাইল ততই তাহার মনের গায়ে কে যেন বসিয়া অনুতাপের কুড়ানি চালাইয়া যাইতে লাগিল। সে বাড়ীতে চা পর্য্যন্ত খাইলও না। আত্মভোলা চিত্তে শিমলার উপকণ্ঠে পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া, কিছুক্ষণ উন্মাদের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন চিন্তায় অতিবাহিত করিল, ফিরিয়া যখন সহরে প্রবেশ করিল, তখন আফিসযাত্রীদের আনাগোনায় সমস্ত পথগুলি পরিপ্লাবিত। অনেকক্ষণ হাঁটিয়া তাহার দেহের তেজ নিষ্প্রভ হইয়াছিল। সকাল হইতে চা খায় নাই। তাহার মাথার কেশাবলী উস্কু খুস্কু অপরিমার্জ্জিত। ভাবিল, বাড়ী ফিরিয়া আসে। কারণ মঞ্জুলা হয়তো তাহার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মঞ্জুলার দোষ কি! একটি নিরীহ নিরাশ্রয়া যুবতীর প্রাণের সৌন্দর্য্য যদি কোন কারণে উপচিত হইয়াই থাকে তবে কি তাহা অন্যায়? মঞ্জুলার প্রতি এতক্ষণ সে, যে অবিচার করিয়াছে তাহার জন্যে নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করিয়া ফিরিবার জন্যে উদ্যত হইল।

কিন্তু জল্পনা কল্পনা ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ কার্য্যের ক্ষেত্রের মধ্যে পদক্ষেপের প্রয়োজন না আসে। অজিত কিছুক্ষণ হাঁটিয়া আর অগ্রসর

হইতে পারিল না। সম্মুখেই একটা চায়ের দোকান দেখিয়া প্রবেশ করিল। কিছু খাবার গ্রহণ করিয়া সে চা খাওয়া শেষ করিয়া পুনরায় পথে বাহির হইল। তাহার আর বাড়ী যাওয়া হইল না। একখানা ট্যাক্সি ধরিয়া মীনাদের বাড়ী উপনীত হইল।

ফুলের বাগান ঘেরা বাড়ীর দুয়ারে অবরোহণানন্তর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করামাত্র, সুকুমারীর চোখে পড়িয়া, সে সুকুমারীর কাছে আসিয়া বসিবার আয়োজন করিতেই তিনি বলিলেন, এমন চেহারা করেছ যে। অসুখ করেছে? এস এস, তোমার মেসোবাবুর ঘরে বসবে।

অজিত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া, উমেশবাবুর বিশ্রাম কক্ষে গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল। সুকুমারী তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া চেয়ার ত্যাগ করিলেন। প্যারীকে ডাকিয়া চা দিবার কথা বলিয়া পুনরায় বসিবার ক্ষণপরেই বলিলেন, দেখ অজিত, আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক জবাব দেবে?

অজিতের সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, সে দিনকার সমস্ত বিসদৃশ ঘটনাটা বোধ হয় মীনা আসিয়া, নানা অলঙ্কারে অব্যয়ে বিভূষিত করিয়া এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছে; নির্ম্মলও হয়তো মঞ্জুলাকে লইয়া উপহাস করিয়াছে, যা নয় তাই বানাইয়া বলিয়াছে। সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক কাষ্ঠবৎ বসিয়া অবশেষে মনের শৈথিল্য বিদূরিত করিল। তাহার ললাটের বলীরেখা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। সে ঢোঁক গিলিয়া বলিল, তা কি বলতে চান, বলুন না।

কথা বলিতে বলিতে অজিত, মনের দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। যদিই বা মঞ্জুলার কথা হইয়া থাকে তাতেই বা কি আসে যায়।

সুকুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই, নির্ম্মল আসিয়া গম্ভীর মুখে উমেশ বাবুর অন্য পার্শ্বে চেয়ার অধিকার করিয়া বসিবামাত্র, অজিতের মাথার সমস্ত ক্রোধযন্ত্র এক সঙ্গে ঝঙ্কার তুলিল। সে এতক্ষণে সুকুমারীর এই প্রশ্ন করার কারণ এবং গাম্ভীর্য্যভরা মুখের অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। নিশ্চয়ই তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহাকে সকলে মিলিয়া জব্দ করিবার মতলবে এত আদর অভ্যর্থনা করিয়া, এত বিনাইয়া প্রশ্ন করিবার আয়োজন করিতেছে। তাহার কপোল দুটি আগুনের মত লাল, ললাট হইতে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

অজিত যেন তপ্ত কটাহের মত তাতল হইয়া রহিল, একবিন্দু স্নিগ্ধ বারিকণাও বুঝি আগুন জ্বালাইয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে চা আসিল। জলযোগ শেষ হইতে তখন ন্যূনাধিক দশ মিনিট বাকী ছিল। উমেশ বাবু গড়গড়ার শটকা মুখে লাগাইয়া বলিলেন, আজ যেন আর শীত গা থেকে যেতে চাচ্ছে না।

সুকুমারী কথাটার পিঠে একটা কথার ঘা মারিলেন, বলিলেন, তোমাকে এত করে বলছি যে, একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে থেকো, তাতো শুনবে না! গরীবের কথা একসময়ে কাজে লাগবে। এখন তো আর আগের মতন গরম রক্ত নেই যে, কোন অনিয়মেই অনিষ্ট করবে না!

তা নয় গো, তা নয়, আমি বেশ ঢাকাঢাকির মধ্যেই আছি, তোমাদের এমন যত্ন, এমন তোয়াজ পেয়ে তো আর নেমক হালালী করতে পারব না! আজ একটু ঠাণ্ডা বেশীই পড়েছে নয় কি!

বলিয়া তিনি অজিতের দিকে চাহিয়া অধরপ্রান্তে একটু হাসির রেখাপাত করিলেন। সুকুমারী এতক্ষণ অজিতের সঙ্গে আলাপের জন্যে অবসর খুঁজিতেছিলেন, এখন উমেশবাবুর কথার রেশ-স্বরূপ বলিলেন, হ্যাঁ,

যা' বলতে যাচ্ছিলুম, অজিত? মীনু আমার পরীক্ষা পাশ করেছে তা জানো তো! বি, এ, পড়বার আগেই তার বিয়েটা দিয়ে দেওয়াই আমাদের মত, তোমাকে আর একদিন এ বিষয়ে বলেছি। আজো বলছি। দেখ, নিমু কিছু আমার পর নয় যে, তার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করব! আজকাল মীনুতো নিমু ছাড়া কথা বলে না। নিমুও মীনার জন্যে যথাসাধ্য করছে, আর সে পাত্রটিও তো কম নয়? হাজার গরীব হলেও বি, এ, পাশ করেছে তো? তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে আমাদের ঘরে যা' থাকবে তা'তেই ওদের অভাব অনাটন ঘুচবে। তবু আমার মনে হচ্ছিল যে, তোমাকে যখন পূর্ব্বে বলেছি তখন একবার শেষ কথা বলে দেখি। কি বল!

শুনিয়া নির্ম্মলের দুই চক্ষু মেঝেতে ধ্যানাবিষ্ট হইল। উমেশবাবু চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। কিন্তু অজিতের অন্তর ক্রোধের লেলিহান রসনায় জ্বলিয়া উঠিল। সে নম্রগতিতে মাথা তুলিয়া রক্তবর্ণ দুই চক্ষুতে ক্রুর কটাক্ষ ফেলিয়া কহিল, মাসিমা এ কথা আপনার পূর্ব্বেই জানা উচিত যে, আমি নির্ম্মল নই। আমাকে আপনার টাকা কড়ির লোভ দেখানো বৃথা। যারা টাকার লোভে বিয়ে করতে চায়, তাদের মত অসহায় মানুষের প্রতি করুণা করাই চলে, শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারি না। আপনারা যদি ইচ্ছে করে মেয়েকে পথের ভিখারীর হাতে তুলে নিশ্চিন্ত হতে চান, তা' হ'লে বুঝব যে, মীনার প্রতি আপনাদের ভালবাসা অতি হালকা ধরণের। আমি মীনাকে অত খেলনা ভাবতে পারিনে, সে যেমন বড় ঘরের মেয়ে, তার উপযুক্ত পাত্র দেখেই বিয়ে দেওয়া উচিত। আমার কাছে বিয়ে দেওয়া না দেওয়ার কথা বলছি না। আমি বিয়ের কাঙ্গাল নই, আর বিয়ে করে জীবিকা অর্জ্জনও আমার উদ্দেশ্য নয়।

কথাটা নির্ম্মলের শ্রবণে গিয়া এক হাঁড়ি তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিল।

সে আবেগে ক্রোধে লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিল। অজিত যে এত হীনতার পরিচয় দিতে পারে, এ তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। সে হৃদয়ের দুর্নিবার প্রতিহিংসার লালসায় অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, মুখ সামলে কথা বলো অজিত, তুমি এ কথা ঠিক জেনো, বিয়ে করলে কখনো শ্বশুরের পয়সার লোভ করবনা। সত্যিকার পরিচয়ের পরেই করব। সেখানে পয়সা কড়ির হিসাব তুচ্ছ।

তাহাদের মধ্যে একটা বিস্বাদ কূট আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় দেখিয়া, উমেশবাবু দু'জনের মুখ বন্ধ করিয়া বলিলেন, তোমরা এ বিষয়টাকে এত ঘোলাটে করে তুলেছ কেন তা' বুঝতে পারছি না সুকু! আমার মেয়ের বিয়ে কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? যা' করতে হয় আমিই করব। তুমি তোমার ঘরে যাও তো নিমু! অজিতকে আর কি বলব।

তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল অবনতশিরে গৃহ ত্যাগ করিল। সুকুমারী বিষয়টার কিছু যৌক্তিকতা খুঁজিয়া না পাইয়া, বিস্ফারিত লোচনে উমেশবাবুর দিকে অপরাধিনীর ন্যায় চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। উমেশবাবু কথাটার বিযাক্ত প্রভাব এড়াইয়া বলিলেন, এসব কথা এখন থাক, অজিত, তুমিতো আর ছেলে মানুষ নও যে কিছুই বোঝ না। কাল তোমাদের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয়ে বাদানুবাদ হয়েছে, তা' অবশ্য সবটা না বুঝলেও কতকটা বুঝি। তার উপরেই বলচি, সংসারটা শুধু খেয়ালের জায়গা নয় অজিত। যত দিন যাবে, সংসার যতই তার ডালপালা নিয়ে ঘাড়ে চেপে বসবে, ততই মানুষের খেয়াল ভেঙ্গে চূরে খান খান হয়ে পড়বে। তোমাকে আর বলবার কিছু নেই, তবু একটু সমঝে চলবে। হ্যাঁ, তুমি শিমলে থেকে কোথায় যাবে?

অজিত ক্ষণপূর্ব্বের রূঢ় আকস্মিক ঘটনার তাপে আড়ষ্ট হইয়া উমেশ-বাবুর কথা শুনিতেছিল। এখন যেন জেলখানা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বস্তির সন্ধান দেখিল। উত্তরে শুনাইল, আর কোথাও যাওয়ার চান্স নেই, আজই বোধ হয় কলকাতায় ফিরতে হবে।

কয়েক মিনিট সকলেই নীরব। ঘরখানি যেন একটা বিমর্ষ আচ্ছন্নতায় গুহার ন্যায় ঝিমাইতে লাগিল। উমেশবাবুর তামাক পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইয়া আসিল। শটকা ছাড়িয়া তিনি দুই হাত কচলাইয়া, অজিতের পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে নাকি একজন মিষ্ট্রেস্ বেড়াতে এসেছেন?

আজ্ঞে, ওঁর নাম কুমারী মঞ্জুলা রায়! আমার কাছে বি, এ'র কোর্স টা দেখে নিচ্ছেন, আগামী সীজনে এপিয়ার হবেন। পড়ার ক্ষতি হবে বলে আমার সঙ্গেই আছেন,—বলিয়া অজিত শান্ত চক্ষে সম্মুখে উপবিষ্টা সুকুমারীর দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল।

সুকুমারীকে 'যেন কেহ ঘুম হইতে খোঁচাইয়া তুলিয়াছে এমন বিস্মিত চক্ষু মেলিয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অজিতের দিকে চাহিলেন। মুহূর্ত্তে বন্ধ জল মুক্ত হইবার মত জোরে বলিলেন, কুমারী মঞ্জুলা! কই তার কথা তো এতদিন শুনি নাই! তোমার সঙ্গে আছে নাকি? ওমা ওর কি আর কেউ নাই! মিষ্ট্রেস্ বুঝি? তা বাছা ওকে সঙ্গে করে আনবার কি দরকার ছিল! পড়া কি আর কয়েকটা দিনে,—

অবশিষ্ট কথা উমেশবাবুর কথায় চাপা পড়িয়া গেল। তিনি উঠিয়া বলিলেন, চল সুকু, আমার চান করতে হবে যে, অজিত এবেলা এখানেই খেয়ে যেও, কি বল?

না আমি চল্লাম, আসি তা হলে মাসিমা,—বলিয়া সে হন হন করিয়া পবনগতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া আসিল।

পথে আসিয়া তাহার পা দুটি বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কিছুতেই সে পথ হাঁটার মতন শক্তি না পাইয়া সম্মুখগামী একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে আসিয়া বুঝিল, সমস্ত বাড়ীখানি যেন তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় নীরবে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৈঠকখানায় প্রবেশ-পথ বন্ধ ছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী জানালার মধ্যে দুইটি উচ্চকিত আকুল দৃষ্টি যে, এতক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখিয়া, সে পরম সন্তোষ লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুলার অটুট শ্রদ্ধার কথা মনে পড়িয়া মীনার অবজ্ঞার বিষাক্ত স্মৃতিটা নিমেষে সমাধি লাভ করিল। এতক্ষণ মীনার বাড়ীতে থাকিয়া সে যে, বৃথা পাথর কাটিয়া রস লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তজ্জন্য নিজেকে তিরস্কার করিল, আপন বুদ্ধির প্রতি ভৎর্সনা নিক্ষেপ করিয়া, সে মঞ্জুলার দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া ডাকিল,—মঞ্জু!

মঞ্জুলা দ্বারপ্রান্তে সরিয়া গিয়া কহিল, এত বেলা হয়েছে, সকাল থেকে চা খাও নি, আব এখন বারটা বাজে তবু নাওয়া খাওয়া নেই। আরম্ভ করেছ কি? তুমি কি মনে ভেবেছ,—এখানে মা নেই বলে আর কেউ তোমার জন্যে মোটেই ভাবে না? আমাকে পরীক্ষা করার ঢের দিন পড়ে আছে, চল এখন।

বলিয়া মঞ্জুলা অজিতকে লইয়া গেল।

আহারান্তে অজিতের পান সিগারেট আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া মঞ্জুলা চলিয়া যাইতেছিল, অজিত হঠাৎ ভাবাবেগে দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল, মঞ্জু, তুমি এতক্ষণ কিছু খাওনি? চা ও না?

মঞ্জুলা গতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক পা চৌকাঠে দিয়া কহিল, দাও এখন ছেড়ে দাও! বাড়ীর কর্ত্তা খেলে না, তার আগেই বুঝি আমার খাওয়া উচিত ছিল! কি যে বলছ, যেন কিছুই জানো না। দেখি সর।

খেয়ে এখনি আসবে তো?—বলিয়া অজিত পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জুলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল, না এখন আর বাজে সময় নষ্ট করতে পারব না। আমার সব জিনিষ পত্র বাঁধতে হবে। চাকর বাকরকে না বলে দিলে, সব ওদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে ফেলবে।

অজিতের মুখখানি অকস্মাৎ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া উঠিল। সে আগ্রহে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তার মানে! তুমি কি আজ চলে যাচ্ছ নাকি?

আমি একা যাব কেন, তোমাকেও যেতে হবে। খালি, খালি কাজ নেই কর্ম্ম নেই এখানে সময়ের শ্রাদ্ধ করে ফল কি? আমি টিকিট কাটাতে পাঠিয়ে দিয়েছি, টাকা তোমার সুটকেস্ থেকে নিয়েছি। বিছানা ঝাড়তে গিয়ে দেখি চাবিটা ভুলে ফেলে গেছ! তার পর এত বেলা হচ্ছে, তোমার মন যেন ক্রমেই এলোমেলো হয়ে আসছে বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তাই আর এখানে থাকা চলে না। বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে থাকবে, আমারও কোন ভাবনা হবে না! কি বল, অন্যায় করেছি!

অজিত মাথা চুলকাইয়া, হাঁ না কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মঞ্জুলা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। সে অন্যমনস্ক ভাবে বিছানায় শুইবামাত্র, তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভ দিনগুলির আনন্দস্পর্শ অনুভব করিতে করিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা টের পায় নাই। বৈকালের দিকে সুকেশা পট্টবস্ত্রবিভূষিতা মঞ্জুলা একহাতে খাবারের ফুলদানী-রেকাবীতে খাবার ও অন্য হাতে চায়ের কেটলি আনিয়া অজিতকে জাগাইয়া বলিল, ও গো

বেলা যে একেবারে ঢ'লে পড়ল। গাড়ীর সময় হয়ে আসছে, উঠে চা খেয়ে চল বেরিয়ে পড়ি।

অজিত উঠিয়া জল পান শেষ করিয়া, মঞ্জুলার কথামত কাজ করিয়া গেল। অবশেষে একটা বুকভরা স্নিগ্ধ তৃপ্তি লইয়া সে গাড়ীতে উঠিল। তৃপ্তির কারণ এই যে, সে মঞ্জুলার কাছে একান্ত নির্ভরতার সহিত আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম। সংসারে আত্মসমর্পণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আনন্দ যে আর কি হইতে পারে, তাহা সে বুঝে না। জীবনের সকল কঠোরতম সংগ্রামে জয়ী হওয়ার ইহাই বোধ হয় একমাত্র সুষ্ঠু পন্থা। মঞ্জুলার এই অযাচিত সাহায্যের জন্যে মঞ্জুলাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া, সে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে তন্দ্রাপুটে নিজেকে এলাইয়া দিল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া মঞ্জুলা তাহাকে আপন বাড়ীতে যাইবার জন্যে অনুরোধ করিল, কিন্তু অজিত বলিল, দুদিন তোমার কাছে একটু বিশ্রাম নিয়ে যাওয়া যাবে খ'ন।

তাহারা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া মঞ্জুলার বাড়ীতেই আসিয়া উঠিল। মঞ্জুলা তাহাকে বাড়ী যাইবার জন্যে পুনরায় অনুরোধ করিয়া বলিল, মা যে কত ভাবচেন। তুমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে বরং কাল এসো।

অজিত কিছুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্ন মুখে মঞ্জুলার সকরুণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, তোমার এখানে থাকাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে মঞ্জু?

হা ভগবান, আমার অতি বড় ভাগ্য যে, তোমার সেবা কর্‌তে পাচ্ছি। তবে আমি বল্‌ছিলাম, মার সঙ্গে দেখা করা উচিত নয় কি? তা' তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকো, বলিয়া মঞ্জুলা উঠিয়া যাইতেছিল। অজিত তাহাকে বসাইয়া বলিল,

মঞ্জু, মা তো একথাও ভাবতে পারেন, যে আমি এখনো শিমলাতেই আছি।

হাঁ তা বটে, বলিয়া মঞ্জু নীচে চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারান্তে অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িল। মঞ্জুলা নূতন বামুনের সঙ্গে রান্নাবান্নার আলাপ করিয়া কখন যে উপরে আসিল, তাহা অজিত টের পায় নাই। কিন্তু নিঝুম রাত্রির বুক চিরিয়া একটা মোটরের আওয়াজ তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া বাজিতেই তাহার নিদ্রা টুটিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়াই মঞ্জুলার চক্ষুর দরবিগলিত ধারার স্পর্শ বুকের উপর অনুভব করিয়া ডাকিল, মঞ্জু।

মঞ্জুলা যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহাতে তাহার বুকের মধ্যে নিদারুণ আঘাত বাজিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া, জোছনাপ্লাবিত আকাশের একটা শুভ্র আঁচল আসিয়া মঞ্জুলার মুখখানি অপরিসীম কৌতূহলে ভরিয়া তুলিয়াছিল। অজিত আবার ঐ নিস্তব্ধ মর্ম্মর মূর্ত্তির দিকে প্রসন্ন-নয়নে চাহিয়া বলিল, মঞ্জু, এত রাত অব্দি তুমি ঘুমোওনি?

মঞ্জুলার কণ্ঠস্বর সিক্ত, আবেগকম্পিত শোনাইল। সে উত্তর দিল,—না ঘুম আস্‌ছিল না।

এতক্ষণ বসে বসে কি ভাব্‌ছ, পাগলের মত। ঘুমোও,—বলিয়া অজিত তাহাকে শোয়াইবার জন্যে উঠিয়া বসিল।

মঞ্জুলার অশ্রু-বাষ্প দৃষ্টিপথ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সে তাহা আঁচলে মুছিয়া বলিল, ভাব্‌ছিলাম, অজিত, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়ে কি কোন অন্যায় হয়েছে? তুমি ধনীর সন্তান, তোমার মান-মর্য্যাদা সম্মান আমার আয়ত্বের অতীত, আমি দরিদ্র, নগণ্য একটি মিষ্ট্রেস্। আমার

জীবনের স্রোতকে তোমার ধারায় মিলিয়ে দেওয়ার কল্পনা নিছক পাগলামো নয় কি ?

অজিত কোমল হস্তে মঞ্জুলার ডান হাতখানি মুঠার মধ্যে আনিয়া বলিল, মঞ্জু, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর্‌ছ ? আমার জীবনের সকল কামনা, সকল সম্ভাবনা আজ যে পথ পেয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে পারি, এমন নিষ্ঠুর আমি নই মঞ্জু !

অজিতের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দৃঢ় প্রত্যয়ের ছটায় উজ্জ্বল। মঞ্জুলা সেই দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে একান্ত গরবিনী মনে করিয়া গদগদভাষণে বলিল, আমায় ক্ষমা কোরো অজিত। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

তার পরে মঞ্জুলা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। অজিত তাহাকে ঘুমাইবার জন্যে পীড়াপীড়ি করাতে সে আপন কক্ষে ফিরিয়া গেল।

ঘোলাটে জল থিতাইয়া আসে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ সোণার আলোতে ঝলমল করে, ভগ্ন পর্ণকুঠীরে প্রাসাদ উত্থিত হয় ; প্রকৃতির রহস্যময়ী লীলা-চাতুর্য্য এমনি উর্ব্বর, এমনি বৈচিত্র্যময় যে, সুকঠিন পাষাণ-প্রাচীরেও নবমুকুলিত তরু রচনা করিয়া সেই রসিকা জননী আপনার সৃজন-মাধুর্য্যের শক্তি প্রচার করেন। সংসারে যাহা যত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা যে, ক্ষণে ক্ষণে কত অবলীলাক্রমে আমাদের দুই চক্ষুর অবিশ্বাসটাকে লজ্জা দিয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। অজিত এ দিকে যতই মঞ্জুলার মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া বিছাইয়া দিতেছিল, ততই সে, মীনার ভালবাসাটাকে চুলচেরা বিচারের পাল্লায় ওজন করিয়া বিরক্তি ডাকিয়া আনিতেছিল। সে অনেক ভাবিয়া বুঝিয়াছিল যে, মীনার ভালবাসার নাগরদোলা হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িবার জন্যে যদিও মীনা দায়ী নয়, কিন্তু তবুও মীনা দায়ী। কেন না তাহার সমস্ত গ্রামখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেও, যে স্রোতাস্বিনী তাহার গ্রামপ্রান্তে থাকিয়া জল দিতে পারিল না, সে সেই নয়নরঞ্জিনী তরঙ্গিনী লইয়া কি করিবে? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নানা বিরোধী যুক্তি তর্কের মাঝখানেও তাহার মন কেবলি বলিল যে, নির্ম্মল যেরূপ গরীব, তাহাতেও এখানে মীনার বিবাহ হওয়া একান্ত অযৌক্তিক।

কিন্তু সংসার নাকি যুক্তির অধীন নয়, ন্যায়শাস্ত্র নাকি মানুষের সত্য ঘটনাবলীর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া স্তম্ভিত, অচল বেশে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। তাই তাহার সকল জল্পনা কল্পনা, স্বস্তির শান্তিনিকেতন ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া, মীনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়া তাহাকে হাঁ বানাইয়া দিল। স্বার্থপর

মন কোন কালেই প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে পারে না। অজিত মীনার বাবার পত্রখানা পরখ করিবার জন্যে, মীনাদের বাড়ীর দিকে যাওয়ার জন্যে গাড়ী সাজাইয়া মঞ্জুলার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। মীনা কলিকাতায় ফিরিয়াছে পর একদিনও সে তাহার সঙ্গে দেখা করে নাই, অথচ আজই সে যাওয়ার জন্যে এত উতলা হইয়া উঠিল! ইহাতে সন্দেহের যতটুকু অবসর থাকে তার চেয়ে ভয়ের তাপ আছে বেশী, তাই মঞ্জুলা তাহাকে একা ছাড়িয়া দিল না।

বাহির হইয়া দুজনে যখন একটা হোটেলে প্রবেশ লাভ করিল, তখন সন্ধ্যার আবিলতা পথের আলোগুলিকে গ্রাস করিতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল। অজিত মঞ্জুলাকে লইয়া সান্ধ্যভোজন সমাপন করিতে হোটেলের মধ্যে একটি কক্ষে চলিয়া গেল।

মঞ্জুলা যতটুকু খায় তার চেয়ে অজিতের উন্মনা মুখের দিকে চাহিয়া থাকে বেশী। সে অজিতের চক্ষুর দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাকে এত রুক্ষ দেখাচ্ছে কেন?

অজিত হাতের কাঁটা চামচ সরাইয়া বলিল, আমার এখন যা' মনের অবস্থা তাতে এক পেগ মদ হলে চলত। তোমার কোন আপত্তি আছে? আমার বুকটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।—বয়!

বয়কে ডাকিবামাত্র, চাপরাসপরা একটি আরদালী আসিয়া অজিতের অর্ডার লইয়া গেল! কয়েক মিনিট পরে বয় এক পেগ মদ ঢালিয়া চলিয়া গেল। অজিতের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া মঞ্জুলা ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, ওকি হচ্ছে অজিত, শেষ কালে ক্ষেপা হয়ে যাবে যে! ছি ছি, মদ খাচ্ছ তুমি?

শোন, পাশেই কেমন গান হচ্ছে, বাঃ! তুমি গাইতে পার মঞ্জু, গাওনা

মঞ্জু একটা গান, আমাদের মীনা বেশ গাইত।—বলিয়া অজিত গানের এক কলি মনে করিবার চেষ্টা করিল।

মঞ্জুলা দাঁড়াইয়া বলিল, চল এখানে আর নয়? না আমি কিছুতেই থাকব না, তুমি জমিদার মানুষ তোমার ভয় কি? আমাকে স্কুলে চাকরী করতে হয় তা জানো?

ড্যাম তোমার স্কুল। আমাকে পথে বসিয়ে আবার স্কুল কি?

এক পেগ মদ ঢালিয়া লইয়া মঞ্জুলার হাতে দিয়া, অজিত আবেগ জড়িত স্বরে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, একটু খাও মঞ্জু, কোন অনিষ্ট হবে না। খাবে না? বুঝেছি মঞ্জু, আমাকে তুমি ভালবাস না।

দুই হাতে মাথা চাপিয়া অজিত টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িল। মঞ্জুলা গ্লাসটা সরাইতে চাহিল! কিন্তু অজিত তৎক্ষণাৎ বলিল, একারণেই বলছিলাম মঞ্জু, আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে তুমি ডাঙ্গায় ছুটে যাচ্ছ। মীনার প্রেম আমি কার জন্য ছেড়েছি জানো! শুধু তোমার জন্য আমার সুখময় বর্ত্তমান, স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ, আমার সকল উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছেড়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে মোটেই আপনার মনে করছ না।

মঞ্জুলা খানিকক্ষণ বিরক্ত চক্ষে অজিতের হিংস্র চক্ষুর পানে চাহিয়া, একটানে মদের গ্লাসটা নীচের টবে ঢালিয়া, মুখ চোখ বিকৃত করিয়া কহিল, চল এখন যাওয়া যাক, নেশা হয়ে আসছে, শেষে বাড়ী যেতে পারবে না।

বয়কে ডাকিয়া বিল মিটাইয়া, অজিত যখন গাড়ীতে বসিল, তখন তাহার মগ্ন চেতনার অস্তিত্ব ঝিমাইয়া আসিতেছে। মঞ্জুলার দ্বারপ্রান্তে গাড়ী দাঁড়াইল। কখন যে মঞ্জুলা তাহাকে টানিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইল, তাহা অজিত প্রভাতের পাখী-কলরব শোনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত টের পায় নাই।

একটা পৃথিবীজোড়া অস্বস্তি লইয়া যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন বিগত সন্ধ্যার ঘটনাবলী ছায়াচিত্রের ন্যায় তাহার মনের উপর দিয়া অবিরল বহিয়া গেল। সম্মুখে আলুলায়িতকুন্তলা মঞ্জুলার দিকে চাহিবামাত্র বিদ্বেষ ঘৃণার লুক্কায়িত প্রেতমূর্ত্তি, স্বল্প আলো অন্ধকারে ঢাকা গৃহকোণ হইতে উঠিয়া আসিয়া যেন তাহাকে উপহাস করিয়া গেল। কাল রাত্রে মীনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার বাড়ীর তোরণদ্বারে নহবৎখানায সানাইয়ের স্বর্গীয় ভৈরবী রাগিণী নবজীবনের আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতেছে। অজিতের সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন দাপাদপি বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য ঐ মিঠা সুর-সাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিল।

চিত্তে গ্লানি, বুকের উপর যেন পাথর জমিয়া আছে। অজিত কোন মতে আগল খুলিয়া বাহিরে আসিযা, মিঠা রৌদ্রস্নাত কলিকাতার দৃশ্যে কতকটা সঙ্কুচিত, কতকটা লজ্জিতভাবে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

এমন অকস্মাৎ তাহাকে যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, সেই ভয়ে সে অত্যন্ত সঙ্গোপনে আপন কক্ষে গিয়া, খিল আঁটিয়া বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে, মুখে তখনো কাঁচা মদের তিক্ত গন্ধ ভরভর করিয়া নির্গত হইতেছে। উঠিয়া স্নান করিযা, যখন সে যোগেশকে ডাকিয়া খাবারের জন্যে বলিল, তখন মীনাদের চাকর প্যারীচরণ একখানা পত্র আনিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পত্রখানি পাঠ করিয়া অজিত বলিল, বিয়ে হয়ে গেছে ?

প্যারী উত্তরে হাসিমুখে বলিল, আপনাদের আশীর্ব্বাদে কোন বিঘ্ন পড়েনি বাবু। তা' হলে আপনি আসছেন তো ? কাল যাননি দেখে, দিদিমণি বড় দুঃখু করেছেন। আপনি থাকলে আরও কত ভাল লাগত বলুন তো !

অজিত যেন প্যারীচরণের কথায় নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। সে বিস্ময়বিদ্ধ লোচনে চাহিয়া পুনরায় বলিল, বিয়ে হয়ে গেছে! মীনা শেষে নিমুকে বিয়ে করলে! ও, না না, প্যারী, আজকেই তা'হলে ওরা নিমুদের বাড়ী যাচ্ছে বুঝি! আচ্ছা তুমি যাও, আমি সময়মত সেখানে থাকব।

আর একবার পায়ের ধূলা লইয়া প্যারীচরণ বহিষ্ক্রান্ত হইল। অজিত যোগেশের হাত হইতে চা লইয়া মুখে লাগাইল, চা-খাওয়া শেষ হইল না। জামা গায়ে দিয়া অভুক্ত অবস্থায়ই সে গিয়া মীনাদের বাড়ীতে দেখা দিল।

উৎসব-মুখর বাড়ীখানির মধ্যে অজিত তাহার মনের বেদনাটিকে নিতান্ত অসহায় দেখিতে পাইল। কেহ তাহার দুঃখের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবে এ কল্পনা সুদূরপরাহত। কিন্তু তাহার একমাত্র ভরসা মীনার উপর। মীনা নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে এবং এমন আরো কিছু বলিবে যাহাতে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতে পারে।

বধূবেশা মীনা তাহার বন্ধুবান্ধব পরিজনের মধ্যে আসর আলো করিয়া বসিয়াছিল। অজিত তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মীনা উঠিয়া তাহার পদধূলি লইয়া বলিল, কাল রাত্তিরে এলে না যে অজিতদা, তোমার জন্যে সকলেই দুঃখ করলে।

অজিত দাঁড়ানো অবস্থায়ই উত্তর দিল, কাল একটা জরুরী কাজ পড়েছিল, তাই বেরিয়েও সময় করতে পারিনি। তোমার তো এখন মোটেই সময় নেই দেখছি, সন্ধ্যের পর দেখা করব'খন।

সন্ধ্যার আগেই আমরা বারাসত চলে যাব। ও ঘরে তোমার বন্ধু

আছেন, ওখানে গিয়ে বসে গল্প গুজব কর না! এ বেলা তো এখানে নিশ্চয়ই খাবে। বিকেলে আমরা চলে গেলে তুমি বাড়ী যেও,—বলিয়া মীনা এমন ভাব দেখাইল, যেন তাহার বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া এখন সে অজিতের সঙ্গে বৃথা কালক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক।

অজিত তাড়াতাড়ি ফিরিবার কালে বলিল, আমি ও ঘরেই যাচ্ছি, সময় মত দেখা করব।

মীনা ফিরিল। অজিত পার্শ্বের বারান্দা ঘুরিবার মুখে সুকুমারীর নজরে পড়িয়া বন্দী হইল। সুকুমারী তাহাকে বসাইয়া আহার করাইয়া বলিলেন, বাবা তোমরাইতো আমার আপন, আমার আর কে আছে বল না। এই তো মীনু কিছু পরেই চলে যাবে, ওর যাওয়ার আগে বিস্তর কাজ। তুমি একটু দেখা শোনা কর বাবা! একলা আর পেরে উঠছিনে। জান সকলেই নিমুকে দেখে বাহবা দিচ্ছে, এমন বর যে মীনার জন্যে আসবে তাতো জানা কথাই বাবা। কেমন ফুটফুটে দিব্যি চেহারা, নম্র স্বভাব চরিত্র তো তোমারও অজানা নেই। কি বল!

সুকুমারী অজিতের নিকট হইতে যত বড় উত্তরের জন্যে যত বড় হাঁ করিয়া চাহিয়াছিলেন অজিত তাহা দিতে পারে নাই। অজিত নির্ম্মলের ঘরে যাইবার কথা বলিয়া শুধু বলিল, তা খাসা বর পেয়েছে মীনা। আর কি চান মাসি মা!

অজিত চলিয়া যাইতেছিল, শুনিয়া, সুকুমারী বলিলেন, আশীর্ব্বাদ কোরো বাবা, আখেরটা যেন সুখের হয়।

নির্ম্মলের ঘরের দুয়ারের কাছে অগ্রসর হইল বটে কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে মন উঠিল না। সে সকলের চক্ষু এড়াইয়া বাড়ী ত্যাগ করিয়া,

তাহার গাড়ীতে বসিয়া অবসন্ন দেহটাকে বিছাইয়া দিল। সে যতটুকু অন্তরঙ্গতা আশা করিয়া মীনার কাছে গিয়াছিল, তার পরিবর্ত্তে নীরস লৌকিকতা পাইয়া তাহার মন নীলাভ হইয়া উঠিয়াছিল। কোচম্যানকে গাড়ী পরেশনাথের মন্দিরের দিকে লইয়া যাইতে বলিয়া, সে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

এতক্ষণে সে বুঝিয়াছে যে,খেলিতে খেলিতে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে, যাহার বস্তুতন্ত্রতা কল্পনার কোনই তোয়াক্কা রাখিয়া চলে না। কোথা হইতে একটা অব্যক্ত পরিতাপ আসিয়া তাহার চিত্ত ভরিয়া মুঠা মুঠা নিরানন্দ ছড়াইয়া যাইতেছে। সম্মুখের রৌদ্র-দগ্ধ ধরণীর কোথাও কোন রস নাই, আশ্বাস নাই, গতি নাই, গীতি নাই, যেন একটা ব্যোমময় অস্পষ্টতা স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল জুড়িয়া অন্ধকারের চাঁদোয়া বিছাইয়া দিয়াছে। মানুষের এই মৃত্যুর ন্যায় ভরাট সময়টাতেই বোধ হয় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। অগ্নিদগ্ধ গৃহের কয়েকটা অকর্ম্মণ্য বাঁশের খুঁটি দেখিলেও যেমন গৃহস্থের মনে কণামাত্র আশার সৌদামিনী লীলায়িত হয়, মীনার বিবাহের পর সেরূপ কোন নগণ্য নির্ভরও আপাততঃ দেখিতে না পাইয়া, অজিত ফাঁকা মন, হালকা দেহটাকে কোন মতে মঞ্জুলার বাড়ীতে আনিয়া বিছাইয়া দিল।

মঞ্জুলা তাহার বিবর্ণ মুখশ্রী সন্দর্শনে প্রথমটা যেরূপ সমবেদনায় উতলা হইয়া উঠিল, তেমনি তাহার নিষ্ঠামাখা সেবায় অজিতের মনের ভার স্বল্প পরিমাণে লাঘব করিয়া দিল। কিন্তু মীনার কথা বলিতে গিয়া অজিত যেরূপ কণ্ঠস্বর ভিজাইয়া তুলিল, মঞ্জুলা তাহাতে সায় দিতে পারিল না। সে বলিল, তোমরা পুরুষ মানুষ, একেতো স্বার্থপর, তার উপর চঞ্চল প্রকৃতির। তোমাদের কোন প্রিন্সিপল্ নেই বললে কোন মিথ্যের দায়ে

পড়তে হয় না। আমি তো বলি, মীনা তোমার ভরসায় বসে না থেকে ভালই করেছে, বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে।

অজিত সবেমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিল। সে প্রসারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তা তুমি বলতে পারো মঞ্জু, তোমার বাড়ীতে আসা অবধি একথাটা আমারও মনে আসছিল। কিন্তু তোমার এখানে আসবার পূর্ব্ব হতেই মীনার মনের স্রোত হেলে পড়ছিল। তাই আমি আর ওদিকে তত গা লাগাইনি। তোমাকে যত আপনার করে পেয়েছি, সত্য কথা বলতে কি, মীনাকে একদিনের তরেও এমন কাছে পাইনি।

এইটুকু মিথ্যে না বললেও চলবে। আমি মীনা নই যে, তোমাকে শাস্তি দিতে যাব।—বলিয়া মঞ্জুলা, একটা হাস্যোজ্জ্বল ভ্রুকুটি দ্বারা অজিতের ক্ষুব্ধ চাহনিটাকে সঞ্জীবিত করিতে চাহিল। কিন্তু অজিতের কাছে এই মিথ্যাব অভিযোগ বিপরীত ফল প্রসব করিল। সে বিছানা হইতে উঠিয়া কোচে বসিয়া বলিল,—তোমাকে বঞ্চনা করার মত জাহান্নমে এখনও যাইনি মঞ্জু! মিথ্যা কথা এমন জায়গায় বলা চলে, যেখানে বুঝতে পারব মহান একটা কিছুর প্রত্যাশা আছে। মীনার সঙ্গে যদি তুমি নিজেকে তুলনা করতে চাও তবে আমার বক্তব্য কিছুই নেই, কিন্তু সোণায় আর পেতলে কোনদিন তুলনা করা যায় না।

কথাটা বলিয়া অজিত এমন রুক্ষ রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চাহিল যে, মঞ্জুলার স্নিগ্ধ সুন্দর ফুটফুটে চক্ষু দুটি দলিত বিষধরের অগ্নিচক্ষুর ন্যায় ক্রূর হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণবলে বক্ষের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া বলিল, একথাটা আগে জানালে বরঞ্চ সুখী হতাম।

তুমি যে বুঝতে পার নাই, তা' আমার বিশ্বাস হয় না।—বলিয়া

অজিত যেন তাহাকে অপরাধিনী মনে করিবার মত কারণ দেখাইতে উন্মুখ হইয়া উঠিল।

মঞ্জুলার কণ্ঠস্বর উগ্র, চক্ষুর কোণ ভারী ছলছল হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাদের মতন ছলনাপ্রিয় এখনো হতে পারিনি অজিত। যদি তাই হ'তাম, তা হলে তোমার এই ধৃষ্টতার প্রশ্রয় কোত্থেকে পাও সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকত। কিন্তু এখনো যথেষ্ট সময় আছে। আমার মনে হয়, তোমার এই মন নিয়ে আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে হলাহল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না।—কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সে পুনরায় বলিল, যা হবার হয়েছে আমাকে রেহাই দাও।

অজিত মঞ্জুলার বিদগ্ধ কণ্ঠস্বর, সিক্ত চক্ষুপল্লবের আবেশে এক নূতন সমস্যার দ্বারে উপনীত হইল। সে বুঝিল যে, মঞ্জুলাকে এইভাবে অনাহুত আঘাত দেওয়াটা অশোভন তো বটেই, অসঙ্গতও বটে। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া মঞ্জুলার মৃণালকম্র কর মুঠার মধ্যে আনিয়া ডাকিল, মঞ্জু!

মঞ্জুলার চোখের কোলে এতক্ষণ, যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় জমিয়া উঠিতেছিল তাহা তৎক্ষণাৎ টপটপ করিয়া কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে সরিয়া গিয়া কহিল, মানুষকে অপমান করারও একটা সীমা আছে অজিত! যাক, তোমাকে ধন্যবাদ যে, এত সহজেই আমাকে রেহাই দিলে, যা' হবার হয়েছে, এবার থেকে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অজিত পুনরায় মঞ্জুলার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, মঞ্জু, তুমি এত সেন্সিটিভ্?

আঁতে ঘা দিয়ে কথা বললে যে দুঃখ না পায়, সে তো মানুষই নয়।

তোমার লজ্জা হ'লনা অজিত ? আমাকে মীনার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার পূর্ব্বে একবার খোলাখুলি বলা উচিত ছিল। তা' হলে এই এসোসিয়েশন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে একটুও কষ্ট হত না।

অজিতের দুই চক্ষু হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সে কম্পিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, ধৃষ্টতার মাত্রা চরমে উঠছে মঞ্জু, তোমার পরম ভাগ্য যে, আমি এখানে পদার্পণ করেছি।

না করলেও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। কেউ তো তোমাকে ডেকে নিয়ে আসেনি ? এখন তোমার মাথার ঠিক নেই অজিত, যাও মীনার বাড়ী যাও।—বলিতে বলিতে মঞ্জুলা কাজের ভাণ দেখাইয়া নীচে নামিয়া গেল।

অজিত উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বাড়ী যাইবার সময় বলিয়া গেল, ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে কথা বল্‌তেও শেখ নাই মঞ্জু, নিজে ইতর কিনা ?

কিন্তু অজিত এই আক্রমণের কোন প্রত্যুত্তর শুনিতে পায় নাই।

বাড়ী ফিরিবার পথে তাহার মনটা কেবল ডুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল! বালিতে স্রোতের জল রোধ করা যেরূপ অসম্ভব, কোনপ্রকার সান্ত্বনা দ্বারাও অজিতের হৃদয়ভরা ক্ষোভের আলোড়ন স্তব্ধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। উর্দ্ধে অধেঃ সম্মুখে পশ্চাতে, যেদিকে সে দৃষ্টিপাত করিল, শুধু এক শূন্যময় আকাশ তাহাকে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিল। এমন দেশে একখানি দিকচক্রবালের পরিখা নাই, রঙ্‌ রূপ নাই শুধু একটি অগ্নি-গোলক শতধা বিস্ফুরিত স্ফূলিঙ্গসায়কে তাহাকে বিদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া আছে। একে একে তাহার বাল্যস্মৃতি, পাঠ্যজীবন, দেবব্রত ও নির্ম্মলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, মীনার সঙ্গে পরিচয়, মঞ্জুলাকে লইয়া শিমলা যাওয়ার কথা, আর তাহার ফলে একটা

অপ্রত্যাশিত ওলটপালটের মধ্যে স্বপ্নলোকের আলেয়াপুরীর অকস্মাৎ পতন—সবই তাহার মাথার উপর দিয়া শরতের পাতলা মেঘের মতন ভাসিয়া গেল। অবশেষে মঞ্জুলার তীব্র মন্তব্য, তীব্রতর অবহেলা, অবজ্ঞাসূচক বাক্যাবলী তাহার শরীরের মধ্যে তপ্ত সীসার স্রোত ঢালিয়া দিল। সংসারে যত প্রকার শাস্তির আয়োজন আবিষ্কৃত হউক না কেন, বাক্য-বাণের মতন বিষমুখ অস্ত্র একেবারেই বিরল। মঞ্জুলা তাহাকে সেই বাণে বিদ্ধ জর্জ্জরিত করিয়াছে, কিন্তু এত দূর স্পর্দ্ধা মঞ্জুলা পাইল কোথায়? গৃহে ফিরিয়া অজিত মনে মনে বুঝিতে পারিল যে, মঞ্জুলার বাড়ীর দ্বার তাহার সম্মুখে চিরতরে আঁটিয়া গিয়াছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, মধ্যাহ্ন আহারের পর যখন সে চুরুট ধরাইতে গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার বাড়ীর মধ্যে চাঁদের পাকা দেখার শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল।

দেবব্রতের সঙ্গে চাঁদের বিবাহ—আর মাত্র তিন দিন বাকি। অজিত আনন্দ-বদনে সমস্ত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইল। দেবব্রতের মা ও ভগ্নির সঙ্গে নানা আলাপে আপ্যায়নে দিনটা কাটাইয়া দিল। উৎসবের মত্ততার মধ্য দিয়া কখন যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, তাহা অজিত টের পায় নাই। কিন্তু দেবব্রতের মা ও ভগ্নি চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানি খালি খালি মনে হইতেছিল। অজিত গাড়ী ডাকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কোথায় যায়? মনের মধ্যে ঘুণ বাসা বাঁধিয়াছে—বাহিরে জোড়া-তালি দিলে তার নিরাকরণ হয় কি? ভিতরে জ্বরের আগুন গণগণ করিতেছে, বাহিরে জল ঢালিলে তাহা উপশমিত হইবে কেন? অজিত কলিকাতার সর্ব্বত্র হাওয়া খাইয়া বেড়াইল, কিন্তু তাহার মনের জ্বালা বাড়িল বই কমিল না। লেক পর্য্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া চৌরঙ্গীর হোটেলে প্রবেশ করিল।

এই সময়েতে মানুষের বিষ পাইলেও খাইবার সাধ জাগে। যদি এক বিপলও নিজের চেতনা সম্বন্ধে ভ্রান্তি আসে, তাহাও বরণীয়। অজিতের তিক্ত উত্যক্ত মনের খোরাক একমাত্র বিলাতী বোতলে বন্দী আছে। সে তাহা আকণ্ঠ পান করিল। সুরা আবহমানকাল মানুষের শোক, সন্তাপ, দুঃখ অবসাদ এমন কি পুত্র-হারার ব্যথা ভুলাইয়া রেজিষ্টার্ড হইয়া আছে। অজিত কিছুক্ষণ তাহার সেবায় নিজেকে ডুবাইয়া রাখিল। কিন্তু গাড়ীতে আসিয়া মদের ফেণায়িত উত্তাল উচ্ছলতার মত তাহার অন্তরখানি তরল হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহার মত্ত জ্ঞানহীন মনের নিভৃত কক্ষে, মঞ্জুলার নম্র মূর্ত্তিখানি সকল অতীতের আবর্জ্জনা ঢেউ দিয়া সরাইয়া জাগিয়া উঠিল। অজিত আর যাইবেই বা কোথায়? সে মঞ্জুলার বাড়ীর দিকে গাড়ী ঘোরাইতে বলিয়া শিথিল দেহে শুইয়া রহিল।

শীতল বায়ুতে অজিতের সংজ্ঞা তূরীয় জগতে বিলীন হইল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সম্মুখের ছাদে নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যকর ফুটফুট করিতেছে। মঞ্জুলা এক গ্লাস মিশ্রীপানা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, এটুকু খেয়ে নাও। অভ্যাস নাই, নতুন মদ খেতে শিখেছ কিনা? দাঁড়াও, আজ আমি নিশ্চয়ই মাকে জানিয়ে দেব।

সরবৎ মুখে তুলিয়া, অজিতের বিস্মৃতির অর্গল খুলিয়া গেল। বিগত সন্ধ্যার কথাগুলি এতক্ষণ একটা ঘুর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে যেন সাজানো ছিল। মঞ্জুলার কথায় সেগুলি পর পর দৃষ্টিগোচর হইতেই অজিত বলিল, আমি রাত্তিরে কোথায় ছিলাম মঞ্জু?

কোথায় আর থাক্‌বে, থাক্‌বার কি আর কোন একটা আলাদা

জায়গা আছে নাকি? গাড়ীতে মাতাল হয়ে শুয়ে—আমাকে কোচম্যানটা এসে জাগাতে, তবে তো আমি আর কোচম্যান দুজনে মিলে ধরে তোমায় উপরে নিয়ে আসি। খাওয়ার জন্যে কত ডাকাডাকি, কে কার? থাকগে, এবেলা এখানে খাবে তো?

একথা জিজ্ঞেস কর্‌ছ যে মঞ্জু?

জিজ্ঞাসা না করার মতন জোর কি তোমার উপর আছে? বলিয়া মঞ্জুলা যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল।

অজিত কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল। পরে আস্তে বলিল, মানুষের ভুল চুক, দুর্ব্বলতাই সবখানি নয়। তার পরেও একটি জিনিষ আছে, যার জোরে তোমার পরে সব দাবীই কর্‌তে সাহস পাই। আর এটুকু মনের জোর আছে বলেই, সময়ে অসময়ে তোমার উপর এসে অত্যাচার করে যাই। এটুকুও কি কামনা কর্‌তে পারি না, মঞ্জু?

মঞ্জুলা উঠিয়া একবার বাহিরে গেল। ভৃত্য নটবরের সঙ্গে কি কথা বলিয়া, পুনরায় ফিরিয়া কহিল, পাতানো সম্পর্ক। অপরের কাছে যতই প্রয়োজনীয় হোক, আমি তার পাত্রী হতে চাই না। বরং একলা পড়ে থাক্‌ব, তবু কারো সহানুভূতির ঔজ্জ্বল্যে নিজকে হীন দেখ্‌তে পারব না অজিত!

আমার অপরাধ হয়েছে, স্বীকার করি।

অবশিষ্ট কথা অজিত বলিতে পারিল না। মঞ্জুলা মাঝখানে বলিল, অপরাধের কোন কথা নয়। একজন রাজা, আর একজন পথের ভিখারী—দুজনে যতই প্রীতি থাক, মনের মিল হওয়াতে স্বাভাবিক বাধা আছে।

অজিত যেন কথাটার গুরুত্ব বুঝিল। সিক্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে

উত্তর দিল, তুমি ভিখারী নও মঞ্জু, তুমিও রাণীর মত সম্মান পাবে, এটুকু বিশ্বাস রেখ।

বলিয়া অজিত যেন তাহার দুই উজ্জ্বল চক্ষুর কাঁচা বিদ্যুৎ দিয়া মঞ্জুলার সমস্ত সত্বাটিকে প্রোজ্জ্বল সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিল। মঞ্জুলা এই কথার কোন উত্তর না দিয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, বাবু এখানে খাবে, একটু তাড়াতাড়ি করে রান্না করে দিও ঠাকুর!

কথাটা শেষ করিয়া মঞ্জুলা ঠাকুরের উদ্দেশে নীচে নামিয়া গেল।

১৪

মীনার বিবাহ হইয়াছে। নির্ম্মল তাহার বর,—আনন্দের কথা বটে। নির্ম্মল কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহা কল্পনায়ও দেখিতে সঙ্কুচিত হইত, সেই আকাশকুসুম হস্তামলকবৎ তাহার একান্ত নিজস্ব-রূপে দেখা দিল। মানুষ স্বর্গও বোধ হয় এমন সময় প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। মীনা তাহার ধ্যান-স্তিমিত নয়নের অস্পষ্ট ছায়া-প্রতীক, জাগ্রতের বিশ্বরূপ, সমাধির কুটস্থ চেতনা। মীনার উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুর বিশাল চাহনি এতদিন তাহার দৃষ্টিকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিতেছিল। আজ যেন সেই বড় বড় দুইটা চক্ষু তাহার হৃদয়-বেদীতে নিষ্কলঙ্ক দীপশিখার ন্যায় দপ্‌দপ্‌ করিতেছে। বিবাহের পর দ্বিরাগমন ইত্যাদি আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানপর্ব্ব শেষ হইল। নির্ম্মল ও মীনা, উমেশ বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

হেমন্তের ফিকে আলোতে সন্ধ্যার আগমনী পরিদৃষ্ট হইল। মীনাদের বাড়ীতে তরুচ্ছায়ে কতকটা স্থানে সন্ধ্যা বেশ আসর জমাইয়া তুলিতেছিল। বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় বসিয়া, উমেশবাবু তামাক টানিতে টানিতে অদূরে দিবাবসান দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে চা দিতে সুকুমারী আসিলেন। একটা নতুন রকম কাট্‌লেট তাঁহার সুমুখে রাখিয়া সুকুমারী বলিলেন, দেখ তো একটু খেয়ে! ওরা ছেলেমানুষ, ওদের মুখে তো ভাল লাগবেই!

তা আমি আর কি দেখব। ওরাইত খাবে। আমার দাঁতও যেন ক্রমেই পড়ে যাবে দেখছি,—খেলে অম্বল হবে না তো!

না গো না, এই একটু খেলেই অম্বল হবে! পরে বরং একটা সোডা খেয়ে নিও। তাও লাগবে না বলছি।—সুকুমারী কাট্‌লেট ভাঙ্গিয়া উমেশবাবুকে খাওয়ানোতে সাহায্য করিলেন। অবশেষে চা ঢালিতে গিয়া বলিলেন, তুমি তো কিছুরই খবর রাখ না, নির্ম্মল কি বলছে শুনেছ?

কি, কি বলছে?—উমেশবাবু যেন একটা সর্প দেখিয়া ভীত হইলেন। সুকুমারী পূর্ব্ববৎ ধীরতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আস্তে আস্তে চায়ের পেয়ালাটি কেদারার হাতায় রাখিলেন। পরে বলিলেন, নিমু বলছে, মীনাকে নিয়ে বারাসতেই থাকবে। এখানে পড়ে থাকবার জন্যে নাকি সে বিয়ে করে নাই।

উমেশবাবুর ব্যগ্র দৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে শমিত হইল। তিনি চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া কহিলেন, আর একটু চিনি দাও সুকু, মিষ্টি ছাড়া আর কোন কিছুরই স্বাদ লাগে না।

সুকুমারী চায়ে চিনি দিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে কহিলেন, কয়েকটা সন্দেশ আছে, খুব ভাল—দু'খানা এনে দেব!

উমেশবাবু সিধা হইয়া বসিয়া উত্তর দিলেন, না,—না গো না, তুমি আমাকে কি ভাবছ! আমার শরীর ক্রমেই যেন দুর্ব্বল হয়ে আসছে। মনে হয় কোন একটা তীর্থস্থানে গিয়ে পড়ে থাকি।

সুকুমারী স্বামীর কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইলেন, স্থির অপলক দৃষ্টিতে উমেশবাবুর ঈষদোজ্জ্বল চক্ষুর নৈরাশ্যভরা চাহনিটা অসহ্য মনে করিয়া সকরুণ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার ডালের ফাঁকে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখা দিয়াছে। একটা রাতজাগা পাখীর একটানা ডাক আসিয়া, সুকুমারীর মনখানিকে পলকের জন্যে নাড়া দিয়া গেল। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার প্রাণের নৈরাশ্য, সুদূরের আহ্বানের

রেশ তিনি একটা কাশির সঙ্গে ঢেউ দিয়া সাময়িক ভাবে সরাইয়া দিলেন। এই রকম তাঁহাকে ইদানীং প্রায়ই করিতে হয়। দুটি জীবনতরী এতদিন শ্যামল বনশ্রেণীমেখলা আনন্দধারার বুক চিরিয়া দুলিয়া দুলিয়া আসিয়াছে, কোনদিন শেষ পাড়ির কুণ্ঠিত স্বপ্ন তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই, যেখানে যত হাটবাজার মিলিয়াছে সে সব স্থলেই আনন্দের বেসাতী লইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু আজ যেন তাঁহারা সেই তরীখানিকে বাহিয়া, এমন এক বিরাট সিন্ধুর কটিদেশে লইয়া আসিয়াছে যেখানে কোন আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের আকর্ষণ নাই—একটি দিকচক্রবালের স্বপ্নময় অনুভূতি যেন তাঁহাদিগকে টানিয়া বিরাট মৃগতৃষ্ণিকার পানে লইয়া যাইতেছে। ওখানে উষার অরুণ জ্যোতি বুঝি আর উঠিবেনা, শুধু অস্তবেলার করুণ রবি তাঁহাদের একমাত্র সঙ্গী,—তাঁহারা এই অলক্ষ্য নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে অন্তরের কোণে শান্তিপ্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। এমনি যখন মনের অবস্থা, তখনও সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে চির উদ্‌বুদ্ধ জাগ্রত রাখিবার প্রয়াস পান। তাই সুকুমারী উমেশবাবুকে জীবনসন্ধ্যার স্বপ্নে বিভোর হইতে দেন না—আজিও তাঁহার কথাটাকে হালকাভাবে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, তা তুমি তো কোন বিষয়েই নিমুর বিরুদ্ধে কথা বলনা! সে ছেলেমানুষ, তার আর বুদ্ধি কুন্‌কের মাপে হবে না তো কি হবে? এই যে সে বলছে, সে মীনুকে নিয়ে বারাসতে গিয়ে থাকবে,—এটা কি কোন কাজের কথা হল?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উমেশবাবুর কলিকাটা বদল করিয়া নতুন কলিকাতে আগুন ধরাইয়া ফুঁ দিতে লাগিলেন। ফুঁ দিবার সময় কলিকার আগুনে সুকুমারীর মুখখানি রঙীন হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। উমেশ-

বাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তা তো যাবেই, বাড়ীতে বুড়া মা রয়েছেন, বিয়ে করেছে, বউ নিয়ে বাড়ী যাবে, এতে আর বলবার কি আছে ?

কিছুই নেই ? হুঁ, এই যে, বলিয়া সুকুমারী নলটা উমেশবাবুর হাতে দিয়া যোগ করিলেন, মীনু তো কোনদিন পাড়াগাঁয়ে থাকায় অভ্যস্ত নয়, তাই বলছি, ওকি সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে ?

উমেশবাবু গম্ভীর-বদনে বলিলেন, বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ের উপর বাপ-মার কোন জোর খাটে না। মীনুও তো চাইছে, তবে তোমার তাতে দুঃখ করবার কি আছে সুকু ? তুমি কি আমার অবাধ্য হতে পার ?

এইবার সুকুমারী যেন একটু ফাঁপরে পড়িলেন। স্বামীর অবাধ্য তিনি জীবনে কোনদিন হন নাই ;—কারণ তিনি মনে করেন, পতিব্রতা না হইলে নারীজন্ম বিফলে গেল। কাজেই মেয়ের বেলায় তিনি যে পক্ষপাতীত্ব করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—তাহা যে শুধু স্নেহবশতঃ, এবিষয়ে তিনি আর কোন মতদ্বৈধ করিতে পারিলেন না,—নীরবে স্বামীর কথাটাতে সম্মতি জানাইয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু তবু মায়ের প্রাণ—মেয়ের প্রতি অকুণ্ঠিত অন্ধ স্নেহ মানিতে চায় না। রাত্রে আহারের পর নির্ম্মলকে একলা ডাকিয়া বলিলেন, বাবা, লক্ষ্মীটি, মীনুকে এখানে রাখতে তোমার আপত্তি কি ?

এই কথা লইয়া নির্ম্মল হাজার কৈফিয়ৎ দিয়াছে, কিন্তু কোন কাজে আসেনা দেখিয়া, সে সুকুমারীকে শান্ত করিবার জন্যে বলিল, অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যে হলেও সেখানে থেকে আসতে হবে! নইলে গ্রামের লোক কি বলবে ? বুড়ো মা ঘরে রইলেন আর আমি এখানে শ্বশুর বাড়ীতে বউ নিয়ে পড়ে রইলাম,—শুনতেও খারাপ লাগে না কি ?

সুকুমারী নিজেকে কতকটা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, তা বাবা, কয়েক দিন থেকে চলে এস, আসবে তো?

আচ্ছা, বলিয়া নির্ম্মল শয়নকক্ষে আসিয়াই দেখিল, মীনা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নির্ম্মল মীনার পার্শ্বে চেয়ারটাতে বসিয়া বলিল, তোমার মা এখন আবার বারাসত যেতে আপত্তি করছিলেন। এখানে তোমাকে রাখবার আমার কোনই আপত্তি ছিলনা, শুধু শিমলাতে অজিত আমাকে শ্বশুর-বাড়ীর পয়সালোভী বলে অপমান করেছিল, তাই আমি অন্ততঃ যতদিন উপার্জ্জন করতে না পারি ততদিন শ্বশুরবাড়ীর সাহায্য নিতে নারাজ। তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে মীনু, তা'হ'লে বল।

মীনা যেন কথাটা আমলই দিতে চাহিল না। সে সহজ কণ্ঠে বলিল, আমি তো আগেই বলেছি, তুমি যা' ভাল বোঝ তাই কর, আমি কোন আপত্তি করব না বরং হাসিমুখে তোমার কাছে কাছে থাকব। আমি চাইনা যে, এ নিয়ে বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কাল সকালেই তো যাওয়া ঠিক?

হাঁ এখন পর্য্যন্ত তো ঠিক আছে। মা হয়তো পথপানে চেয়ে বসে থাকবেন।

নির্ম্মলের কথা শুনিয়া মীনা বলিল, কালই যাব, এতে আর কোন আপত্তি কোরো না, যাবে তো?

হ্যাঁ, যাব'খন, বলিয়া নির্ম্মল আর কথা বাড়াইতে চাহিল না, বিছানায় শুইয়া পড়িল। পরদিন প্রভাতে বিদায়ের অশ্রুমালা সমস্ত বাড়ীখানিকে ছাইয়া ফেলিল। বর বধূ গুরুজনকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল। তাহারা যখন বারাসতে পৌছিল, তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া বসি বসি করিতেছে। কাঁচা মেঠো রাস্তার উপর দিয়া, মীনাদের গরুর গাড়ী ক্যাঁচর

ক্যাচর করিয়া আসিয়া, যখন তাহাদিগকে নির্ম্মলদের বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে জামরুল গাছের নীচে দাঁড়াইল, তখন নূতন বধূ দর্শনেচ্ছু বিস্তর চক্ষু আসিয়া মীনাকে লজ্জিত করিয়া দিল। নির্ম্মলের মা বিধুমুখী আসিয়া বধূবরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। পল্লীগ্রামের নারীমহলে মীনাকে লইয়া সোর-গোল পড়িল, কেউ বলে অপ্সরী, কেউ বলে লক্ষ্মী, কেউ বলে খাসা বউ, কেউ আবার বেশ ভূষার আধুনিকত্ব লইয়া একটু বক্র ভণিতা করিতেও ছাড়িল না।

এমনি নিরাড়ম্বর অভ্যর্থনার মধ্যে মীনা শাশুড়ীর পায়ে গড় করিয়া তাহার নূতন জীবন সুরু করিল। মীনা এখানে আসিয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিল না, মুখ বুজিয়া ঘরকন্না করে, ইঁদারার জল তোলা হইতে বাসন মাজা, ঘব ঝাঁট দেওয়া এমন কি বাড়ীতে যে গাইগরুটা আছে তার গোয়ালটাও মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিতে হয়; কিন্তু সে যে অনভ্যস্ততার মধ্য দিয়া বুদ্ধির জোরে এসব চালাইয়া যাইতেছিল, তাহা নির্ম্মল যে একেবারে বুঝিত না তাহা নয়। তবে তাহার বলিবার বা সমবেদনা প্রকাশ করিবার উপায় কোথায়? আজন্ম স্বচ্ছল গৃহে ভোগবিলাসে প্রতিপালিত মীনা যে, তাহাদের পল্লীগ্রামের মাটীময় জীবনের ছন্দে পা মিলাইয়া চলিতে পদে পদে কুণ্ঠিত, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে আর সংশয় কি? কিন্তু নির্ম্মলের সে অর্থবল নাই,— যাহাতে সে মীনা ও তাহার মাকে লইয়া পাকা সহরে বসবাস করিতে পারে। এ কারণ সে, মীনার দিকে চাহিয়া তাহার অপটু হস্তের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করে, কিন্তু কোন প্রতীকার খুঁজিয়া পায় না।

মীনা অবশ্য যে ভাবে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম আয়ত্বাধীন করিয়া আনিতে-ছিল, তাহা তাহার পক্ষে যতই নিদারুণ নির্ম্মম হউক, তবু সে পল্লীগ্রামের

নিরলঙ্কার নিরভিমান চাকচিক্যে কতকটা আপনাকে ঢালিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে এখানে যেমন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে পায়, তেমনভাবে সূর্য্যদেবকে সে জীবনে কোনদিন দেখিতে পায় নাই। এখানে চব্বিশ ঘণ্টা নানা সুমধুর মিষ্টভাষী বিহঙ্গের দল তাহার কাণের কাছে নন্দন-প্রীতি বহিয়া আনে, তাদের ভাষা যদিচ বুঝা যায় না তবু যেন ইহা কত পরিচিত কত পুরাতন। তাহাদের বাড়ীর উত্তরদিকে আম জাম নারিকেল গুবাকু গাছের ঘন বাগানটা যেন একটা চিঁড়িয়াখানা। বিচিত্র-রঙ্গের, বিচিত্র ঢঙ্গের পাখীগুলি প্রত্যহ সেখানে বসিয়া পল্লীর প্রভাত ও সন্ধ্যারতি বিজ্ঞাপিত করে। এই বিহঙ্গ-গুঞ্জন, এই আলোছায়ার দোলা, এই তরু-লতার মর্ম্মরগীতি, এইখানেই মীনার মুক্তি। এই মাদকতায় নিজকে নিমজ্জিত রাখিয়া, সে নূতন সংসারে নূতন কর্ম্ম-কঠোরতা বিস্মৃত হইতেছিল।

কিন্তু যতই সে নিজেকে ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার আশা-ভরসা, মহান জীবনের স্বপ্নের অঙ্কুরগুলিকে চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, ততই যেন অন্তরের নিভৃত প্রদেশে একটি নৈরাশ্যের বিকৃত মূর্ত্তির জন্ম হইতেছিল। ক্রমে শাশুড়ীর আদেশ উপদেশ তাহার কাণে অপমান বহিয়া আনিতেছিল। তাহার উচ্ছ্বাস অচিরেই আরম্ভ হইয়া গেল।

সেদিন মীনার শাশুড়ী বিধুমুখী প্রাতঃকালে উঠিয়া বাড়ীময় গোবরছড়া দিয়া, ঘাটে যাইবার প্রাক্কালে হাঁকিয়া বলিলেন, ওগো বৌমা, এত বেলা অব্দি যে ঘুমোচ্ছ, এ তো গেরস্তবাড়ী, সংসারের তো পয় অপয় কিছু বুঝছিনা; সহুরে মেয়ে হয়ে শুয়ে থাকলে তো আর কাজ-কর্ম্ম চলে না, সকাল সকাল উঠে বাসন-কোসন মেজে নিয়ে আসবে। রোজ রোজ তোমাকে নিয়ে ফ্যাচ ফ্যাচ করতে খুব আনন্দ লাগে কি?

বলিতে বলিতে বিধুমুখী কুয়াসার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মীনা সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া কাপড় গুছাইতেছিল। বাহিরে শীতের আচ্ছন্নতা সমস্ত বাড়ীটাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। পার্শ্বের বনে কয়েকটা পাতিকাকের ডাক পরিশ্রুত হইতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে একেকটা ডাহুক রাত্রি-শেষের প্রশান্তির মর্ম্ম ভেদ করিয়া চীৎকার করিল। মীনা কয়েক মিনিটের মধ্যে বাহির হইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া, তৈজস-পত্র লইয়া ইঁদারার পারে গিয়া বসিল। অদূরে পেয়ারা গাছের ডগ ডাল হইতে একটা কাঠবিড়ালী নামিয়া, মীনার পাশ ঘেষিয়া চালতাগাছের উপরে দৌড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে প্রভাতের অরুণ-চন্দনে দিক-ললাট পরি-শোভিত হইল। মীনাকে তখনো ইঁদারার পার্শ্বে দেখিয়া বিধুমুখী ফেরার পথে বলিলেন, এত মুন্সীয়ানা করে বাসন মাজলে চলবে কেন? গোয়াল-ঘরটা সাফ করে এসগে, রান্না চাপিয়ে দিলে তবে তো নিমু দশটার সময় বেরোতে পারবে! কি যে কর বৌমা!

মীনা বাসনমাজার কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল। তথাপি এই তীক্ষ্ণ উপদেশ তাহার কাণে সুধাবর্ষণ করিল না, সে বাসনগুলি লইয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি আর বসে আছি এখানে? এই তো যাচ্ছি মা, এখুনি সব সেরে ফেলব?

যাও, যাও,—মুখের উপর জবাব দিতে তো আরম্ভ করেছ! কত করে বললুম, রূপ ধুয়ে কি আমি জল খাব, এসব পরী নিয়ে কি আমার কাজ-কর্ম্ম চলে?—কথাটা শেষ করিয়া উঠিতেই প্রতিবেশী বিন্দীর মা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিগো ঠাকুরুণ পিসি, ভোর না হতেই তোমার বাড়ীতে সোরগোল শুনে এলুম। বলি বৌ তো এমন চাঁদের মতন দেখতে, কাজ-কর্ম্মে বুঝি একেবারে ডাঁসা, তা হবেই তো,

ছিল সহরে, জুতো পায়ে গটমট করে ইস্কুলে গেছে, বাপও বড়লোক, কোন কাজ কর্ম্ম শেখায় নি, এই বৌ কি তোমার আমার ঘরে পোষায় ?

সহানুভূতিমাখানো কথায় বিধুমুখী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তিনটে কাল এক রকমে গেল নাকি ? আমার পোড়া কপাল বৈ তো নয়, না হলে হাত রথ থেকেও আমার ভাগ্যে পরতোলা হয়ে থাকতে হবে কেন ?

তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া সেই সময়ে নির্ম্মল মুখ ধুইতে যাইতেছিল। সুতরাং তাঁহাদের কথাবার্ত্তার স্থর ফিস্‌ফিসানিতে শেষ হইল।

নির্ম্মল কলিকাতায় যাইবার জন্যে একটু তাড়া দিয়া খাইতে বসিল। মীনা ভাত দিতে দিতে বলিল, দেখ যদি কোন একটা উপায় করতে পারো। ধর্ম্মের তিরিশ দিন অভাব থাকলে সংসার চলে কি করে, এ সমস্ত অনাটনের মধ্যে মারও মাথা বিগড়ে যাচ্ছে।

নির্ম্মল আহার শেষ করিয়া পান লইয়া বলিল, দেখি যদি কিছু করতে পারি ; একটা কোম্পানীর ম্যানেজার তো আশা দিয়েছেন, যে সময় পড়েছে, কোন দিকেই বিশ্বাস রাখতে পারি না।

মীনা চলমান নির্ম্মলকে শুনাইল, তুমি যে একটা উপন্যাস লিখেছিলে তার কি হোল, চেষ্টা করে দেখনা যদি বেচতে পারো।

হুঁ, বলিয়া নির্ম্মল পথে বাহির হইয়া পড়িল। প্রভাতের কোলাহল সেও শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহার অবস্থাটি ঠিক উলুখড়ের ন্যায়। মীনা যে তাহার পিতামাতার কত আদরের কন্যা তাহা সে বিশেষভাবে জানে। এদিকে মাকে সে আজ পর্য্যন্ত স্বচ্ছল করিয়া তুলিতে পারে নাই, এ বিক্ষোভও তাহার মনের স্বাধীন মতামতের মাথাটাকে চাপিয়া রাখিত। এমতাবস্থায় মাও মীনার আলাপপ্রসঙ্গে সে কেমন করিয়া বাধা দিবে ? সে বুঝে যে, একটা মাত্র পথ খোলা আছে, টাকা উপার্জ্জন ; অর্থ

আসিলেই তাহাদের সংসার নির্ঝঞ্চট হইবে। টাকা হইলে সে উভয়কে কলিকাতায় আনিয়া বামুন চাকর রাখিয়া সাংসারিক তুচ্ছ কলহের কারণগুলিকে বিদুরিত করিতে পারে। কিন্তু কেন যে বিধাতা তাহার কল্পনাটাকে এত দীর্ঘ করিয়া তুলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার পক্ষে নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

এত অভাব অনাটনের মধ্যেও তাহার একটা দীপশিখা ছিল যাহা তাহাকে কলিকাতার দিকে পথ দেখাইয়াছিল। ইহাই কুহকিনী আশা। সে ভাবিয়াছিল, বিবাহের পরে হয়তো বা তাহার কোন একটা চাকরী হইবে। কিন্তু ইহা যে নিছক কল্পনা তাহা বুঝিতে এক মাসই যথেষ্ট। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের যে কোনই সম্পর্ক নাই—কল্পনা যে মানুষের আকাশ-কুসুম, অবকাশের মিথ্যা সান্ত্বনা, ভূঁয়া তৃপ্তি, আর বাস্তব যে মানুষের সকল বুদ্ধি, প্রগাঢ় আবেগের দম্ভকে নির্দ্দয়ভাবে পদদলিত করিয়া যায় তাহা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিল।

একমাস পরে সে মীনার পত্র পাইল। মীনা লিখিয়াছে,—একটা জিদের বশবর্ত্তী হয়ে তার সম্ভ্রম রক্ষার্থে যে দুঃখ যে হীন লাঞ্ছনা পেতে হচ্ছে, তা হয়তো তোমার কাছে সুখদায়ক, কিন্তু ইহা আদপেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলছে। আমি আর সংশয় না করে থাকতে পারছি না যে, তুমি আমার চাইতে তোমার জিদ্‌টাকে অধিক ভালবাস। এভাবে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি অনভ্যস্ত পরাভবে, যদি আমার জীবন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়, তবে এতে যে কোন সুষ্ঠু সার্থকতা আসতে পারেনা এ বিশ্বাস ক্রমেই আমার মনে দৃঢ় হয়ে আসছে। তোমাকে শেষ কথা বলি, এভাবে ক্রিমীকীটের ন্যায় বাস করার চাইতে দুজনে গিয়ে আমার পিত্রালয়ে বাস করা শোভন হবে।

পত্রখানি নির্ম্মল বারবার পাঠ করিল, মীনার দুঃখের মাত্রা কত গভীর আবর্ত্তে আলোড়িত হইতেছে তাহা অবধারণ করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু একটা বিষয়ে সে মর্ম্মাহত হইল। তাহারা দুইজনে আসিয়া পিত্রালয়ে বাস করিবে, কিন্তু তাহার মা যে বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইবে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। মীনা হয়তো শাশুড়ীর প্রতি কোনই দরদ রাখিতে চায়না, কিন্তু সে নিজেও কি মাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ? এই অন্তহীন সমস্যায় হাবুডুবু খাইয়া নির্ম্মল উত্তরে লিখিল,—যদি একান্তই তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে থাকবার ইচ্ছে হয় তবে তুমি যেতে পার, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি যত সহজে আমার মাকে ছেড়ে যেতে পারবে আমি তত অনায়াসে পারব না। আমি তোমাকে সুখে রাখতে পারি না বলে যে, তোমাকে দুখের প্রাচীরে বন্দী করে রাখব এমন অমানুষ হওয়ার মতন ধৃষ্টতা নেই। তবে এ-কথাও মানুষ মাত্রেরই জানা উচিত যে, দুঃখ চিরকাল থাকে না, সাময়িক দুঃখে অবিচলিত থাকাই বিবেচকের একমাত্র পথ।

তাহার এই পত্রখানা পাইয়া মীনা কি ভাবিল, তাহা অবোধ্য। কেন না, সে কোন উত্তর দেয় নাই। নির্ম্মল আরও কয়েকদিন চাকুরী খুঁজিয়া কাটাইল, কিন্তু সন্ধানের মধ্যে কল্পতরুর চিহ্ন পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে হতাশ হইয়া পড়িল।

১৪

এদিকে মীনা যথাসম্ভব বিধুমুখীর সঙ্গে মানাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীর সঙ্গে বধূর যে সম্বন্ধ তাহাতে কোন বধূই আত্মসমর্পণ করিতে চায় না। মীনা ভাবিয়াছিল, নির্ম্মলের অর্থাগম হইলে কলিকাতায় গেলে, বোধ হয় তাহাদের এই বিরক্তিকর দিনগুলির অবসান ঘটিতে পারে। কিন্তু এইদিক দিয়া কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। প্রতিদিন শাশুড়ীর একান্ত অনুগত বাঁদীর ন্যায় খাটিয়া খাটিয়া, কারণ সে নিজেকে ইহা ছাড়া অন্য কিছুই জ্ঞান করিতে পারে নাই—তাহার দেহ শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। অনেক চিন্তা করিয়া কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া, বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া অজিতকে আসিবার জন্যে লিখিয়া দিল।

সেদিন সকাল হইতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশের গায়ে গায়ে মেঘের আস্তরণ। এমন একটা ধূসর উত্তরীয়ে শিরশ্ছদ আবৃত ছিল যে, সেখানে কোন কালে কোন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া যেমন ভ্রম হয়, তেমনি সুদূর ভবিষ্যতে সেই বিরাট জমিতে কোন গ্রহ অঙ্কুরিত হইবে বলিয়া সন্দেহ আসে,—যেন একটা অন্তহীন ঘন পদার্থে ব্যোমময় নভোতলের নিরাকার অঙ্গখানি লেপিয়া পুছিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। মীনাদের ঘরের কোণের নারিকেল সুপারীগাছের প্রফুল্লিত শাখাপত্র হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। পায়ে পায়ে কাঁচা উঠানে কাদা উঠিয়াছে। ক্রমে বেলা বাড়িয়া মধ্যাহ্নের দুয়ারে ঠেকিয়াছে। মীনা এক ঝিক বাসন লইয়া ভিজিতে ভিজিতে গিয়া,

ইঁদারার পার্শ্বে বসিয়া মাজিতে আরম্ভ করিল। একটা ভিজা দাঁড়কাক তাহার উচ্ছিষ্ট বাসনগুলির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া ছিল, মাঝে মাঝে মীনাকে প্রতারিত করিয়া বাসনের গায়ের সুরসাল খাদ্য ছুঁ মারিয়া লইয়া যাইতে কসরৎ দেখাইয়া তাড়া খাইয়া হতাশ হইতেছিল। বনচালতা ও ভিজা গুল্মের গন্ধে মীনার জলে বসিয়া কাজ করার তিক্ততা ততটা প্রকট হয় নাই।

সূর্য্যদেব নিতান্ত বেহায়া, তাই দ্বিপ্রহরে যত বৃষ্টিই থাকুক একটিবার তার মুখটি না দেখাইয়া পারেনা। একসঙ্গে বারিবর্ষণ ও রৌদ্রকিরণ দেখিয়া মীনার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। সে একবার এই অনুপম সঙ্গমদৃশ্য দেখিয়া, পুনরায় মাথা গুঁজিয়া বাসন মার্জ্জনা করিতে লাগিল। এমন সময় বিধুমুখী দাওয়া হইতে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো বৌ, জলে যে ভিজছ একটু খেয়াল আছে! একমুঠো বাসন মাজতে কি এত দেরী হয় নাকি, না অসুখ ডেকে এনে আমাকে জব্দ করতে চাও! বলি, অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে সংসারের কাজকর্ম্ম করবে কে?

মীনার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সে হাত চালাইয়া উত্তর দিল, এই যে যাচ্ছি মা!

বিধুমুখী আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু মীনা বিষয়টাকে তত হালকাভাবে উড়াইতে পারিল না। সংসারে তাহার অসুখ হইলে যে, শুধু কাজকর্ম্মে বাধা ঘটিবে ইহাই শাশুড়ীর লক্ষ্য। কিন্তু ইহা ছাড়া যে, সংসারে তাহার কোন প্রয়োজন বাহুল্য, তাহা যেমন শাশুড়ী মনে ভাবেন তেমনি নির্ম্মলও ভাবে। অন্যথা নির্ম্মলও তাহার জীবনকুসুম সমীরান্দোলিত তরুশিখা হইতে ছিনাইয়া আনিয়া, তাহার যত্ন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেনা কেন? একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের অকস্মাৎ

আগমনের অবসাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, মীনা কাঁদিয়া ফেলিল। সিক্ত অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বাসনগুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া, সম্মুখে অজিতকে দেখিয়া লজ্জায় অভিমানে তাহার মাথাটা আপনাআপনি কাদাভরা উঠানের পরে ঝুঁকিয়া পড়িল। সে কোন কথা না বলিয়া অজিতকে তাহার অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিয়া বারান্দায় না উঠিয়া, পশ্চাৎমহলে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। বাসনগুলি ঘরে রাখিয়া বলিল, অজিতদা, এই অবেলায় এলে যে, ভিজে কাপড় ছাড়বে এস।

অজিত যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে উপর হইতে বাঁশঝাড়ের জল টপ্‌টপ্ পড়িতেছিল। সে স্থিরভাবে বলিল, মীনা, আমার কাপড় ছাড়তে হবেনা, তুমি এই নরক থেকে এখুনি বেরিয়ে এস আমার সঙ্গে,—আমার জন্যে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

মীনার মলিন চক্ষুর উপর দিয়া একটা উৎসাহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু তাহা নিমেষের তরে। পরক্ষণেই তাহার ছলছল চক্ষু তুলিয়া সে বলিল, অজিতদা, তা কি করে হবে, শাশুড়ীকে না বলে কেমন করে যাব!

কে তোমার শাশুড়ী, দাওয়ায় ঘুমোচ্ছেন যিনি! একটা মেয়েকে যারা পশুর মত খাটায় তাদের প্রতি আবার সহানুভূতি কেন? এস, না হলে আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব, এখানে থেকে এমনি মৃতের ন্যায় বাস করছ, তা' এতদিন জানাওনি কেন?

মীনার সর্ব্বদেহে একটা প্রবল উচ্ছ্বাস শক্তির দ্যোতনায় উত্তাল হইয়া উঠিল। সে শুধু ডাকিল, অজিতদা!

তাহার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরে, ব্যথাবিহ্বল করুণ আঁখির দিকে চাহিয়া, অজিত অগ্রসর হইয়া তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় লইয়া আসিল। মীনার

তখন বুদ্ধির ক্ষেত্রে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছিল, সে কোন হিসাব বিবেচনা করিবার মতন ফুরসৎ পাইল না। পশ্চাতে বাড়ী ঘর শাশুড়ী, বাসন কোসন, তাহার সঙ্গে সদ্যপরিচিত বৃক্ষতরু লতাগুল্ম, তাহাদের গোয়ালঘরের গাইগরু মায় বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত পান্থশালার হাঁড়ি-কুড়ির ন্যায় ফেলিয়া, সে অজিতের সঙ্গে মোটরে চাপিয়া পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। মেঘলা আকাশের প্রচ্ছন্ন পটান্তরালে দিনমণি আছে কিনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু তাহার বর্ষণমুখর মধ্যাহ্নে নিশ্চিন্ত নির্ভয় যাত্রার সাক্ষী হইবার জন্যে যে একটি প্রাণীও ছিল না তাহা অবধারিত।

ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর বিলম্ব জানিয়া, তাহারা মোটরেই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। কন্‌কনে ভিজা বাতাসের জন্যে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া দু'জনে ভিতরে বসিয়া রহিল। গাড়ী শোঁ শোঁ করিয়া চলিতেছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকুনির দরুণ দুজনেই সোজা হেলান দিয়া বসিয়াছিল। অজিত মীনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এমনি করেই এদেশের মেয়েদের জীবন শেষ হয়। যাদের কোন সঙ্গতি নেই, তারা বিয়ে করতে যায় কেন? মেয়েরা কি একটা খেলার সামগ্রী? মীনা, আজ তোমার কি মনে হচ্ছে!

মীনা আস্তে আস্তে বলিল, আমি কিছু বলতে পারছিনে।

অজিত মীনাকে উত্তেজিত করিবার জন্যেই বলিল, বিয়ে করাটার মধ্যে যেমন কোন বিচার নাই, বিবেচনা নাই, সংসার চলবে কোত্থেকে তার কোন ব্যবস্থা নাই, তেমনি বিয়েটা ভাঙ্গার মধ্যে কোন বিচার না থাকা উচিত। তোমার মতন শিক্ষিতা মেয়েকে, যে এরকম হাভাতে সংসারে এনে অপমান করতে একমুহূর্ত্তও লজ্জা বোধ করে না—তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখাই মানুষের কাজ, নয় কি?

সে যে কি পরাভব অজিতদা, একে তো সংসারে অভাব, বাসনমাজা, বাটনা বাটা, কাপড় কাচা থেকে গোয়াল সাফ পর্য্যন্ত সবই করতে হয়েছে, তার উপর শাশুড়ীর বাক্যবাণ, মনে হচ্ছিল আত্মহত্যা বোধ হয় এর চেয়ে ভাল ছিল।—বলিয়া মীনা তাহার উচ্ছ্রিতপ্রায় অশ্রু রোধ করিবার জন্যে আঁচলটা তুলিয়া ধরিল।

অজিত আবেগে তাতিয়া উঠিল। নন্‌সেন্স্‌! বলিয়া সে কিছুক্ষণ মীনার সকরুণ আঁখির দিকে তাকাইয়া পুনশ্চ বলিল, তবু নিমুটাকে বলেছিলাম, এইভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করে কোন ফল হবে না। আজকাল যেভাবে অশ্লীল সাহিত্য চলছে তার কাছে নীতিবাদ তলিয়ে যায়।

মীনা কথাটাতে সম্মতি দেখাইতে না পারিয়া বলিল, ইম্‌মর‍্যাল কোর্স।

অজিত রুক্ষভাবে উত্তর দিল, তাতে কি যায় আসে? অর্থের সংস্থান করতে লোকে চুরি ডাকাতি করে, অর্থের জন্যে পতিতারা পথে দাঁড়ায়, এসব যদি বাজারে চাহিদা পায় তবে অশ্লীল সাহিত্যই বা পাবে না কেন?

মীনা কথাটা গ্রাহ্য করিবার মতন উৎফুল্ল না হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। মীনার অবসন্ন দেহে ঘুমের দাগ বসিয়াছিল, সে কোণ ঘেষিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল। কলিকাতায় গাড়ী পৌঁছিবামাত্র অজিত তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। মীনা চক্ষু মেলিয়া কলিকাতার জনস্রোত ও কোলাহলের মধ্যে তেজস্বী রৌদ্রকিরণের সুখপ্রদ স্পর্শ পাইয়া, ডিম্ব-মুক্ত বিহঙ্গশিশুর ন্যায় চাহিয়া বিস্ময়-বিপন্ন কণ্ঠে ডাকিল, অজিতদা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

অজিত ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দ্দেশ দিয়া, মীনার কথার উত্তর দিল, পরেশনাথের মন্দিরের দিকে!

পায়ের তলায় বিষধর মাড়াইলে মানুষ যেরূপ আতঙ্কিত হয়, মীনার মুখামেজ সহসা তদ্রূপ সফেদ হইয়া উঠিল, বলিল, কেন, ওদিকে কেন?

অজিত অকস্মাৎ একটা দোলা খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, বলছি পরে, এই যে এসে পড়েছি।

গাড়ী নির্দ্দেশমত থামিবামাত্র অজিত গাড়ী হইতে নামিয়া, ভাড়া চুকাইয়া মীনার হাত ধরিয়া নামাইয়া, মঞ্জুলার বাড়ীতে প্রবেশ লাভ করিল। নির্ব্বাক হতচেতনপ্রায় মীনা মঞ্জুলার ঘরে গিয়া আচ্ছন্নের ন্যায় মেঝেতে বসিয়া পড়িল। মঞ্জুলা এতক্ষণ একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছিল, অকস্মাৎ অভ্যাগতদের আগমনে একটু আশ্চর্য্যকণ্ঠে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিল, বোন যে এই অসময়ে, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আমার ভাঙ্গা কুটীরে স্বয়ং চাঁদ নেমে এসেছে, এস উপরে উঠে বস।

মঞ্জুলার কথার মধ্যে কতখানি নির্জলা আর কতখানি ক্লেদ তাহা মীনার অলোড়িত চিত্তের অনুপ্রেক্ষণিকায় ধরা পড়িল না। কিন্তু সে এমন আড়ষ্টের মতন নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে, তাহার পায়ের সজীবতা যেন কোনকালেই ছিল না মনে হইল। সে অনড় স্থানুর মতন বসিয়া থাকিয়া অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, অজিতদা, আমি যে বাড়ী যাব!

অজিত তখনো গৃহের মধ্যে আসে নাই, সে উত্তরে বলিল, যাবেই তো, কয়েকটা দিন পরে গেলে কি কোন ক্ষতি হবে?

মীনার ইচ্ছা হইতেছিল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। মানুষ যে এতদূর দায়িত্বজ্ঞানহীন হইতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে এই প্রথম। সে পরক্ষণেই এই ঘটনার বিকৃত নগ্ন প্রতিচ্ছবিটি কল্পনা করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আস্ফালন করিয়া বলিল, অজিতদা, তোমার উদ্দেশ্য আমি কিছু

বুঝতে পারছিনে। আমাকে মঞ্জুদির বাড়ী আনবার কথা ছিল কি? আমাকে এক্ষুণি বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

অজিত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মঞ্জুলা বলিল, কেন মীনু, আমার এখানে কি থাকলে অন্যায় হবে? এ তোমার দিদির বাড়ী মনে করে রইলেই বা!

মীনার যে অশ্রুবিন্দু এতক্ষণ পত্রপল্লবে সঞ্চিত শিশির বিন্দুর ন্যায় টলমল করিতেছিল, তাহা যেন প্রভাতের সমীরস্পর্শে টপটপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে আবেগসিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, দিদি, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দাও!

মঞ্জুলা যেন মীনার কথাটা শুনিতেই পায় নাই এমন উদাসীনতাসূচক কণ্ঠে অজিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে, জামাকাপড় ছেড়ে চান করতে যাও,—রান্না তৈরী আছে।

অজিত এতক্ষণ যেন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় ত্রিভুবনশূন্য স্থলে লম্বমান ছিল। মঞ্জুলার কথার উত্তরে আশ্বস্তকণ্ঠে বলিল, না আমি এখুনি বাড়ী যাব, কাল চাঁদকে আনতে যেতে হবে। আজ বাড়ী থাকতেই হবে।

চলমান অজিত শুধু একবার মীনার দিকে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে চাহিল মাত্র। পরক্ষণেই তাহার অবয়ব দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া গেল। মীনা অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নপীড়িতের ন্যায় উঠিয়া, চৌকাঠের কাছে নিষ্পলকনেত্রে কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। অজিত তাহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর সকল চেতনাশক্তি যেন এক ফুৎকারে কর্পূরের মতন উবিয়া গেল। ক্ষণেকের মধ্যে তাহার বাদলসিক্ত মূর্ত্তির সম্মুখে, শ্বশুরবাড়ীর ত্রাণকারী অজিতের কায়াটি, যেন এক ভীষণ কৃষ্ণকলঙ্কের ছায়ায় বিকৃত বেশ ধরিয়া, তাহার বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কক্ষগুলি অসহ্য ক্ষতে

পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। অজিতের অন্তরটি যেন তাহার কাছে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। অজিত কি তবে তাহাকে অপরিসীম করুণার পাত্রী মনে করিয়া এ স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে? স্থির ঘন অঞ্জন-ভারী আকাশের অকস্মাৎ বিদ্রবণের ন্যায় তাহার উদাসীন দুই নয়ন ভরিয়া ধারাশ্রাবণ ঝরিয়া পড়িল।

হয়তো বা সে আরও বহুক্ষণ এমনিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে মঞ্জুলা তাহাকে টানিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল, মীনু, ছেলেমানুষী কোরো না, কোথা থেকে অজিতবাবু তোমায় এনেছেন বল দেখিনি!

মীনার উত্তাল হৃদয়-সিন্ধু চন্দ্রমার কিরণস্পর্শের ন্যায় মঞ্জুলার স্নেহবাক্যশ্রবণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, দিদি, অজিতদা আমার কথা একবারও ভাবলেন না? আমার স্বামীও বাড়ী ছিল না, শাশুড়ী ঘুমোচ্ছিলেন, কাউকে বলা নেই কওয়া নেই, মার কাছে পৌঁছে দেবেন বলে, অজিতদা আমাকে এখানে রেখে কেন চলে গেলেন?

মঞ্জুলার কৌতূহলক্ষিপ্ত চক্ষুদুটি পলকের মধ্যে বিঘূর্ণিত হইল মাত্র। সে স্নেহব্যগ্র উষ্ণকোমল স্বরে মীনাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, আয় বোন, তুই তো আর একটা অস্থানে পড়িসনি! যে পর্য্যন্ত তোর এই অভাগিনী দিদি আছে, জানিস মীনু, সংসারে তোর সীঁথির সিঁদুর-লেখা ম্লান করতে কেউ পারবে না। আয় উঠে আয়, চান করে খেয়ে নে, তোকে বাড়ীতে আমি নিজেই রেখে আসব।

মীনার অবাক কণ্ঠ শুধু বলিল, চল। সে মঞ্জুলার কথামত স্নানাহার শেষ করিতে গেল। কিন্তু আহার তাহার গলাধঃকৃত হইল না। তাহার স্মরণ-বীণায় বাজিয়া উঠিল শ্বশুর বাড়ীর বিদায়-ক্ষণ-গুঞ্জন। দাওয়ায়

শায়িতা বৃদ্ধা শাশুড়ী,—হয়তো তিনি নিদ্রান্তে তৈয়ারী খাদ্যের আশায় রান্নাঘরের দিকে স্নানের তৈল সংগ্রহে যাইয়া উৎকণ্ঠায় বৌমাকে ডাকিতেছেন ;—হয়তো সেই পিটপিটে বৃষ্টির তলে প্রাঙ্গণভরা কর্দ্দম মাড়াইয়া বৃক্ষছায়ানির্জ্জন বৃষ্টির গন্ধ-শীতল পথপানে হাঁকিয়া ডাকিতেছেন, বৌমা কোথায় গো ? তাহাদের যে মেণী বিড়ালটা মীনার পায়ে পায়ে ঘুরিয়া, কখনো ল্যাজটা মীনার পায়ে ছোঁয়াইয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মতন মেউ মেউ করিয়া যাইত, সে বোধ হয় এতক্ষণে এঘর ওঘর করিয়া অবশেষে বৃদ্ধার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিতেছে,—এমনি করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের যাবতীয় চেতন জড়পদার্থের দাবী দাওয়া একত্রে ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়া মীনার মনের দুয়ারে হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল। তাহার মুখে অন্ন রুচিবে কেন ? মঞ্জুলা তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিলেও, যথাসাধ্য অনুরোধ করিয়া পরাস্ত হইল।

আহারান্তে তাহারা যখন দ্বিতলের শয়নপ্রকোষ্ঠে গিয়া বসিল, তখন আকাশ আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বমুক্ত বিজয়ীর ন্যায় হাসিয়া উঠিল। মঞ্জুলা পানের বাটা সম্মুখে লইয়া বলিল, এস বোন, এইবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মীনা তাহার পরিধেয় বস্ত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইতেছিল। মঞ্জুলা তাহাকে বলিল, এমন কাজও করতে আছে বোন ! স্বামী জানল না, শাশুড়ী জানল না—তুমি চলে এলে বাপের বাড়ী ! একথা কি কোন রকমে বিশ্বাস করবে কেউ !

মীনার পাংশুবর্ণ মুখে তখন রক্তের লেশমাত্র ছিল না। সে পরাজয়-ভীত দুর্ব্বলের ন্যায় গলার স্বরে দন্ত বিথারিয়া বলিল, বাপের বাড়ী গেলে কোনই তর্ক থাকত না, অজিতদার এ কেমন বিচার হোল ?

দোষ অজিত বাবুর দিলেও একটা কথা আমাদের জানা উচিত—আর তা সব সময়েই কবচ করে রাখা উচিত মীনু, স্ত্রীলোকের ভালমন্দের ভার তার আপন হাতে না থাকাটা নিতান্ত অন্যায়। পুরুষ হয়তো নারীর অন্তরটা চিনতে সহজে পারে না, কিন্তু আমাদের কি উচিত নয়, প্রথম দর্শনেই তাকে আমার সত্য পরিচয়টি জানিয়ে দিই ?

কথাটা তলাইয়া বুঝিতে মীনার একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে তাহার কাপড়পরা শেষ হইয়া যাওয়াতে, মঞ্জুলা তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া বলিল, এস, বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব'খন।

স্বচ্ছ লোহিতনীলাভ সূর্য্যকরের লঘু ছায়াতে সমস্ত গগনাঙ্গন মায়ামগ্ন ছিল। তাহারা দুইজনে এলগিন রোডে মীনাদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

১৫

নির্ম্মল পত্রের কোন উত্তর পায় নাই বটে কিন্তু মীনার প্রতিমুহূর্ত্তটি তাহার মানসপটে চার্টের ন্যায় অঙ্কিত হইতেছিল। মীনা যে সত্যই গ্রাম্য জীবনযাত্রা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার রূঢ়তাটা নির্ম্মলের প্রাণে মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছিল। কলিকাতার পাষাণময় পথে পথে তাহার ব্যগ্রব্যাকুল মনটি লইয়া পাগলের ন্যায় ঘুরিয়াছে, কিন্তু কোন চাকুরীর সন্ধান মেলে নাই! অবশেষে ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন বটে কিন্তু তাহার সাহিত্যিকের অহমিকার মাথাটি নির্দ্দয়ভাবে মুড়াইয়া দিলেন।

নির্ম্মলের উপন্যাসখানির ক্রেতা জুটিল। কিন্তু সর্ত্ত এই যে, বইয়ের লেখক ও মালিকীস্বত্ব—দুইয়ের কোনটাই তাহার প্রাপ্য হইবে না; এবং এই জন্যেই একজন ধনী তাহাকে দুইশত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভদ্রলোক এই প্রস্তাব করিবার সময়েই তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, ঘরে বসিয়ে অভাব ভোগ করার চাইতে এ সুবর্ণ সুযোগ বুক দিয়ে গ্রহণ করা উচিত।

নির্ম্মল শুধু বলিয়াছিল, নামটাও থাকবেনা! কিন্তু এই মৃতপ্রায় আবেদন পর্য্যন্ত। সে হাঁ না কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার দারিদ্র্যের সুযোগে, যে বিলাসী ধনী আপনার নাম কিনিতে যাইতেছেন, তাহার মূলে সে টাকার দৌরাত্ম্য ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাইল না। এমনি করিয়া দরিদ্রের মস্তিষ্ক ও শরীরের অপব্যয়ে ধনীর জগত নানা সম্পদে সম্মানে পরিশোভিত হয়। বারবার নির্ম্মল এই

অপমানসূচক প্রস্তাবটাকে পুরুষকারের দোহাই দিয়া বিদূরিত করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সে বইখানি বিক্রয় করিয়া দিল। তাহার অহঙ্কার, তার আত্মসম্মান-লালসা, যশোসত্তা পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় কয়েকবার লৌহদণ্ডের অন্তর দিয়া, বাহিরের নীল নির্ম্মুক্ত শ্যামায়মানা ধরিত্রীর মায়াছবি অবলোকন করিয়া, পুনরায় শান্ত সুবোধ বালকের ন্যায় শুইয়া পড়িল। এমনি করিয়াই মানুষের প্রয়াসাবলী অদৃষ্ট হস্তের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই নির্ম্মলের মুখশ্রী মেঘ-প্রসবিত আকাশের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার স্বার্থ বলি দিয়া আজ সে মীনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে—আজ সে মীনা ও মাকে সঙ্গে আনিয়া কলিকাতায় বাস করিয়া ভাগ্য-পরীক্ষার অধিকারী হইবার সুযোগ পাইবে—ইহা ছাড়া তাহাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি আর কি আছে?

নির্ম্মলের চিত্ত আনন্দরসে আপ্লুত, পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কিছু জিনিষপত্র কিনিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

তখনো আকাশের অস্তরবি সিন্ধুপারের রহস্যময় তোরণ খুলিতেছিলেন। গ্রাম্যপথ স্বল্প নিবিড় অন্ধকারে, বিহঙ্গের কলকাকলীতে, গৃহগমনেচ্ছু গাভী-শাবকের নৃত্যভঙ্গীতে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মল যত দ্রুত চলিতেছিল, ততোধিক তুরন্ত তাহার মন বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিতেছিল। সে যখন বাড়ীতে প্রবেশ করিল তখনো তাহাদের গাভীটা কুলগাছের তলায় পড়িয়া রোমন্থন করিতেছে। সে অন্য কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বড় ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া ডাকিল, মা কোথায় গো, মা!

বিধুমুখী তুলসীতলায় প্রদীপ দিতেছিলেন। তিনি সেস্থান হইতে সাড়া দিলেন, নিমু এসেছিস?

হ্যাঁ মা,—বলিয়া নির্ম্মল আঙিনার উত্তরদিকে মায়ের কাছে যাইয়া বলিল, বাড়ীতে এখনো সব ঘরে আলো জ্বলেনি কেন মা, মনে হয় যেন বাড়ীতে কেউ নেই !

বিধুমুখী প্রদীপটা বসাইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি নির্ম্মলের কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, আলো জ্বলেনি তো কি হয়েছে বাবা, আমি একলা মানুষে কি এসব তাড়াতাড়ি পারি ? বৌমা যে কেলেঙ্কারীটা করে গেল,—গলার স্বর অবনমিত করিলেন,—ওবাড়ীর বিন্দীর মা বলে কিনা, ও স্বচক্ষে দেখেছে, একটা লোকের সঙ্গে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে ! ওকি, অমন গুমরো মুখ করে কোথায় যাচ্ছিস, রান্নাঘরে সে নেই, বিশ্বাস কর, সে আজ সকালে কোথায় চলে গেছে !

নির্ম্মল ধপাস করিয়া দাওয়াটায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন গেল, কোথায়ই বা গেল ? তোমার সঙ্গে কি কোন ঝগড়া করে গেছে ?

বিধুমুখী একটা লণ্ঠনে আলো জ্বালিয়া নির্ম্মলের আনীত জিনিষগুলি ঘরে তুলিয়া বলিলেন, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে। নিমু, এই কলঙ্কের কথা আর তুলিসনে। আমার আজ চৌপর দিন লোকের কাছে জবাব-দিহি করে করে মুখে ফ্যাঁপড়া উঠেছে। বৌমা কি লেখাপড়া শিখে শেষে আমার মুখে আমার শ্বশুরের বংশে চূণকালী দিয়ে গেল না ? নিমু আয়, এ নিয়ে পরে পরামর্শ করে যা হয় করিস।

নির্ম্মল এতক্ষণ যে আশা, যে আনন্দ-সম্ভাবনার মরীচিকার আকর্ষণে বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাহা একটা প্রহেলিকার ভৌতিক ক্রিয়ায় তাহার চক্ষুর সম্মুখে স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলের অবসান ঘটাইয়া দিয়া গেল। মীনা কি সত্যই চলিয়া গিয়াছে,—যদিই তাহা সম্ভব হইল, তবে তাহার এই একমাস যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া উন্মাদের অষ্টপ্রহর কাটাইবার কি

প্রয়োজন ছিল, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু উপন্যাসখানি বিক্রয় করিবার কি যুক্তি ছিল? যাহার জন্যে তাহার দিবসের অক্ষমতার যন্ত্রণা নিশীথের স্বপ্ন-সান্ত্বনায় জুড়াইয়া, সে কলিকাতার বন্ধুবান্ধবের কাছে অজ্ঞাতবাসীর মত চাকুরী চাকুরী করিয়া ঘুরিতেছিল, সে তো মীনা ছাড়া আর কেহ নয়? কিন্তু মীনা তাহার পরিশ্রম, তাহার গভীরতম নিষ্ঠা, একাগ্রতার মূল্য দিল কোথায়? মীনার শিক্ষা, আচার ব্যবহার বজায় রাখিবার সাময়িক ত্রুটি কি তাহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের চেয়েও বলবতী হইয়া উঠিল? তবে মানুষ বিবাহ করে কিসের জন্যে? স্ত্রী যদি স্বামীর হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরস্বচ্ছ সরলতার প্রদীপ অস্তিমিত না রাখে, সে যদি স্বামীকে সুখে সম্মান, দুঃখে সাহস না দেয় তবে এ সংসারের সমস্তই ছলনা,—মানুষ চিরকাল কি নর-নারীর আকুল মিলন-দোলায় বৃথাই দুলিয়া মরে?

ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মলের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, মায়ের শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে উপবাসী ঘুমাইয়া রহিল।

পরদিবস যখন সে শয্যাত্যাগ করিল তখন তাহার দুই চক্ষের তলায় কালডুরে শাড়ীর পাড়ের মত গভীর দাগ পড়িয়াছে। এমনি একটা গাঢ় আত্মধিক্কারের কলঙ্ক-লেখা তাহার মনের উপর খাদ কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার সম্মুখের ধরণী বিষাক্ত ঠেকিতেছিল। সে আস্তে আস্তে মায়ের কাছে গিয়া বলিল, মা, এ গ্রামে কি আর আমাদের বাস করা ভাল হবে? চারদিক থেকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ হবে!

বিধুমুখী যেন এই কথাটাই বলিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, জানো, এক্ষুণি সব আসবে, আর তোমাকে যেন পিঁপড়ের মতন বেড়ে ধরবে।

নির্ম্মল কয়েক মিনিট নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, তা হোক, চল, আজ

কালের মধ্যেই আমরা কোলকাতা চলে যাই, সেখানে আমি বাসা ভাড়া করে এসেছিলাম তোমাদের নেবার জন্যে। এখন তো কোন প্রকারেই আর এখানে থাকা যায় না।

বিধুমুখী পুত্রের প্রস্তাবে যেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, তুই যে বাসা ঠিক করে এলি, তোর কি কোন চাকরী হয়েছে, না টাকার যোগাড় আছে ?

নির্ম্মল জামার পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া, মায়ের সম্মুখে রাখিয়া সস্মিত-বদনে বলিল, মা, এতে প্রায় দু'শ টাকা আছে, এর দ্বারা কি আমরা কয়েক মাস থাকতে পারব না ? এর মধ্যে যেভাবেই হোক একটা কাজের ব্যবস্থা করে নেব।

বিধুমুখীর হাসি অধরের কানায় কানায় ফুলিয়া উঠিল। তিনি নোট-গুলি নির্ম্মলের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, তুই রাখ, আমি যে মনভোলা, কোথায় রেখে ভুলে যাব, বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া কয়েক ফোঁটা তরল অশ্রু-কণা কোলের উপর শুইয়া পড়িল। মায়ের অকস্মাৎ ব্যথা-বিহ্বলতার কারণটি নির্ম্মল মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিল, মা, তুমি কাঁদছ, সামান্য টাকা নিয়ে আমরা কত আহ্লাদিত—তাই না ? আবার দিন আসবে মা, আশীর্ব্বাদ কোর, তোমার অক্ষম ছেলে আবার তোমাকে সেই রায়-গৃহিনী করতে পারবে।

বিধুমুখী আঁচলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, জয়কালীর কৃপা থাকলে হবে নিমু, আমি তো আর টাকা পয়সার অভাবে কষ্ট পাবনা, তোদের সুখ হলেই আমার আনন্দ। আমি কি আর বুঝিনা,—বলিতে বলিতে তাঁহার অশ্রু-সিন্ধুতে ঢেউ উঠিল,—আমার বৌমা আজ কি কারণে আমাদের ত্যাগ করে গেছে, তা কি আমি বুঝিনা ভাবছিস, বৌমা বেশী

খাটতে পারেনা, কাজ কর্ম্ম করে অভ্যেস নেই, আমি ও অক্ষম, পয়সা-কড়িরও অনটন, নইলে আমার আগুকার অবস্থা থাকলে বৌমা আমার পায়ের উপর পা তুলে বসে খেত !

চক্ষু মুছিয়া বিধুমুখী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। নির্ম্মল তাহার ঘরে আসিয়া, যাওয়ার আয়োজনের চিন্তা করিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে পাকা কথা হইল। তাহারা তুই দিন পরে সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া কলিকাতায় যাইবে। বাড়ীটি ও গাইগরুটা বিন্দীর মার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। পর দিবস প্রাতঃকালে উমেশবাবুর পত্র আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, মীনু মঙ্গলমতেই পৌছিয়াছে, পথে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, তুমি যত সত্বর পার এখানে আসবে।

নির্ম্মল উমেশবাবুর পত্রে কতকটা সমাশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু মীনা যে কেন চলিয়া গিয়াছে, একথাটার কোন তাৎপর্য্য কি তবে মীনা তাহার বাবাকে বলে নাই ? অথবা উমেশবাবু জানিয়াও এই লজ্জাস্কর ঘটনাটা অনুল্লিখিত রাখিয়া দিয়াছেন। নির্ম্মল এই রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার বিশেষ চেষ্টা না করিয়া জিনিষপত্রের মোটঘাট বাঁধাছাদা করিতে মনোনিবেশ করিল।

পরদিবস বিধুমুখীকে বিদায় দিবার জন্যেও কতক এবং এদৃশ্য দেখিবার জন্যেও কতক লোক নারীপুরুষে জমায়েৎ হইয়া নির্ম্মলের বাড়ীখানিকে উৎসবমুখর করিয়া তুলিল। একটা গরুর গাড়ীবোঝাই মাল ও অন্য একটাতে বিধুমুখী ও নির্ম্মল বসিয়া সমবেত গ্রামবাসীর সজল দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া গ্রাম ত্যাগ করিল। বিধুমুখী আঁচলের কোণ ভিজাইয়া, সমবয়সী সকলকে আশীর্ব্বাদ উপদেশ দিয়া, উদাস দৃষ্টিতে তাঁহার শ্বশুরকুলের ভদ্রাসন, স্বামীর আবাসবাটীর দিকে চাহিয়া, কারুণ্যে লোল মুখখানি

আর্দ্রাভ করিয়া তুলিলেন। ট্রেণে উঠিয়াও তাঁহার নয়ন সেই বৃক্ষরাজী-শ্যাম, চিরনূতন গ্রামের দ্রুত-অপসারিত চতুর্দ্দিকে অপলক হইয়া রহিল।

বাসায় পৌঁছিয়া মোটঘাট যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে, নির্ম্মল বিধুমুখীকে একটু শয়নের অনুরোধ জানাইল। বিধুমুখী বলিলেন, বাবা, জয়কালীর স্থলে এসে আগেই শোব কি রে, চল কালীঘাটে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসি।

অতঃপর তাঁহাদের কালীদর্শন ইত্যাদিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া রাত্রের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া, অজিত ঘর গুছাইতে আরম্ভ করিল। তাহার অপটু হস্তে যতদূর সম্ভব গৃহকক্ষগুলি সুবিন্যস্তভাবে সাজাইয়া আহার শেষ করিল।

রাত্রি অধিক হইয়া যায় দেখিয়া বিধুমুখী নির্ম্মলের ঘুমাইবার জন্য অনুযোগ দিতে লাগিলেন। নির্ম্মলের আঁখিপল্লবে ঘুমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার গৃহের এলাকায় গাঢ় অন্ধকারেব বোঝা যত অধিক গভীর হইতেছিল ততই তাহার মনের দৃশ্যপট ব্যথাস্মৃতির পাদপ্রদীপে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। মীনার মনখানি সে অনেকদিন যাবৎ পরীক্ষা করিয়াও বিরাট নারীচিত্তের অজ্ঞাত রহস্যপ্রহেলিকার অতুল সৌন্দর্য্যের ন্যায় দুর্ভেদ্য দেখিতে পাইল, ইহাই তাহার মহৎ দুঃখ।

পর দিবস একরাশ এলোমেলো চিন্তাজালে জড়িত নির্ম্মল শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে বারান্দায় একটা আসন পাতিয়া সদ্যশোকাহতের ন্যায় বসিয়া রহিল। বিধুমুখী ঝিকে কাজকর্ম্ম দেখাইয়া উপরে আসিলেন। নির্ম্মলের জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া ডাকিলেন, নিমু, মুখ ধুয়ে খাবার খেতে আয় না, বেলা বাড়ছে তো!

নির্ম্মল মুখপ্রক্ষালনাদি শেষ করিয়া জলখাবার খাইল। জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া, বিধুমুখী নিকটবর্ত্তিণী হইয়া বলিলেন, হ্যাঁরে, একটিবার বৌমার খবরটা নিয়ে আয না, ও ছেলেমানুষী করেছে বলে তো আর আমাদেরও তাই করলে চলবে না! বেয়াইমশায়কে আমার কথা বলিস। ওখানে যেন থেকে যাসনি, যদি থাকবার কথা বলেন তো অন্য একদিন যাবি বলে আসিস!

নির্ম্মল যে মীনার তত্ত্ব লইবার জন্য কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, এমন কি এজন্যে তাহার গৃহবাস যে অরণ্যে বসতির ন্যায় ঠেকিতেছিল, এই কথাটা সে বিধুমুখীকে জানিতে দেয় নাই; কিন্তু অপরপক্ষ স্বেচ্ছায় এ প্রস্তাব করাতে সে প্রচ্ছন্ন ভাণের মধ্যে বলিল, কি হবে, যার যে পথ ভাল লেগেছে সে তাই বেছে নিয়েছে, আমি কেন যাব, সে যাবার সময় কি আমাকে জানিয়ে গেছে?

বিধুমুখী পুত্রের অভিমানটাকে ক্রোধের রঙে পাইয়া শান্ত, কোমল কণ্ঠে বলিলেন, এ কথা বললে চলবে কেন নিমু, ও তো আমাদের বৌ, আমরা না দেখলে কে দেখবে, স্ত্রীলোকের স্বামীর ঘর ছাড়া আর কোথায় জায়গা আছে বল, না রে তুই আমার কথা রাখ, এখুনি একবার ঘুরে আয় গে।

নির্ম্মল আর প্রতিবাদ করিল না। আস্তে আস্তে শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তরতরে আলোতে কলিকাতা জুড়িয়া একটা অবাস্তব ঔজ্জ্বল্য ফাটিয়া পড়িতেছিল। নির্ম্মল ধীরে ধীরে সূর্য্যস্নাত এলগিন রোডের উপর লাল ডগ্‌ডগে শ্বশুর বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ বুকে লইয়া নির্ম্মল গিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া তাহার সমস্তই বাষ্পান্তর্গত জলকণার ন্যায় বুদ্বুদে পরিণত হইল। সে বেতো ঘোড়ার মতন অবসন্ন দেহটাকে ঠেলিয়া কোনমতে বাড়ী বহিয়া আনিল। অজিত যে মঞ্জুলাকে আনিয়াছে একথা তাঁহারা জানেন, কিন্তু মীনা যে কেন এমন একটা অবিমৃষ্যকারীতার দায়ে বিপদগ্রস্ত করিল, এ কথাটা যেমন মীনা বলে নাই তেমনি তাহার মাতাপিতাও তলাইয়া ছাঁকিয়া বাহির করিতে প্রয়াস পান নাই। এবং এই প্রকার আব-হাওয়ার মধ্যে নির্ম্মল কোনমতে নিয়ম রক্ষাস্বরূপ শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মীনাকে ডাকিয়া আলাপ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ মীনা শুধু একবার তাহার কাছে আসিবার জন্যে অগ্রগামিনী দেখা গেল মাত্র—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিলীয়মান অঞ্চল দেখিয়া নির্ম্মল উঠিয়া আসিয়াছিল।

এতদিনে সত্যই তাহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। মীনা যে তাহারও পূর্ব্বে অজিতকে ভালবাসিত এবং পরেও যে এই দুইজনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় তো নয়ই বরং প্রমাণ-স্বরূপ মীনার গৃহত্যাগই যথেষ্ট, ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মলের বিরাট শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর সকল আনন্দনৃত্য নিমেষে অদৃশ্য হইয়া মরুপ্রান্তরের দগ্ধ বালুকাবিথারে পরিণত হইল।

মীনার প্রতি তাহার গভীর বিদ্বেষ আরোপিত হইল, মীনার সৌন্দর্য্য-গৌরব, শিক্ষার মাহাত্ম্য, ভদ্রতার কৌলিন্য এমন কি মীনার ভালবাসার দুর্ব্বল ইঙ্গিতগুলিপর্য্যন্ত তিক্তকষায় আস্বাদনে তাহার সম্মুখে অস্পৃশ্য হইয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনের দীর্ঘপথ নিঃসম্বল মুসাফির সাজিয়া বেড়াইবে তবু স্ত্রীলোকের দয়ার ভিখারী হইয়া মহত্ত্বের বলিদান করিবে না।

১৬

ক্রমান্বয়ে বারোটি মাস ছয় ঋতুর অর্ঘ্য মাথায় লইয়া আসিয়া, বিদায় লইবার মুখে মুখে মীনার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। নির্ম্মল এই এক বৎসরের মধ্যে আর মীনাদের বাড়ী মাড়ায় নাই। কিন্তু মায়ের প্রাণ লইয়া সুকুমারী কন্যার এই অসহ্য অবস্থাটা কেমন করিয়া সহ্য করেন? তিনি উমেশবাবুকে খোঁচাইয়া নির্ম্মলকে পত্র লিখাইয়াছেন, কিন্তু নির্ম্মল শুধু উত্তরে লিখিয়াছে যে, তাহার একটা চাকুরী লইয়া সে ব্যস্ত, সুতরাং তাহার পক্ষে আসা অসম্ভব। কিন্তু সুকুমারী এই শুষ্ক কৈফিয়ৎটাতে বক্র ভ্রুকুটি করিয়া একদিন মীনাকে চাপিয়া ধরিলেন। পুত্র-সৌভাগ্যবতী মীনারও অন্তরের নিভৃত বক্ষপ্রদেশে নির্ম্মলের স্মৃতিটি দেবজ্যোতিতে অহরহ প্রতিভাত হইতেছিল। সে অনেকদিন অসংখ্য মুহূর্ত্তে আপনার চিত্তের মধ্যে, নির্ম্মলের আগমন-তরঙ্গ অনুভব করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ শুক পক্ষীর ন্যায় মুদিতনেত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছে, কিন্তু নির্ম্মলকে না পাইয়া বিরাট অবসাদের বন্যায় তাহার দুই চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে পরিপ্লাবিত হইয়া মলিনত্ব পাইয়াছে মাত্র। একেক সময় যখন কোলের খোকা হরিণশিশুর মতন চোখ তুলিয়া বিশ্বের নন্দনকানন রাঙাইয়া তুলিত, যখন দুই পা হাত ছুঁড়িয়া অবোঝ কান্না জুড়িয়া দিত, তখন তাহার মাতৃপ্রাণ নির্ম্মলের জন্যে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া আকর্ষণ করিতে চাহিত। যুগে যুগে মানবমন যে শিশুডোরে চিরবন্ধনে আবদ্ধ সেই পুষ্পকোমল গ্রন্থির তলায় থাকিয়া মীনার মন কেমন এক অব্যক্ত শিহরণে নির্ম্মলের জন্যে লালায়িত হইয়া উঠিত। কিন্তু বক্ষপ্রদেশ অন্তর্দাহে জ্বলিয়া খাক হইয়া গেলেও সে লজ্জার

তুষাবরণে আপনার মর্ম্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিতে সাহস পায় নাই। এমনি করিয়া শিশু তিন মাসের হইল।

ঠিক এই সময়টাতে সুকুমারী তাহাকে মরণবাণ হানিলেন। সুকুমারী কথাপ্রসঙ্গে নিরালায় বলিলেন, হ্যাঁরে মীনু, সত্যি করে বল দেখি নি, কেন নিমু এমন বিরক্তি দেখিয়ে যাচ্ছে ?

সুকুমারী যেন মেঝেতে ঢালা কালী দুই হাতে মাখিয়া মীনার মুখ-খানিতে সযত্নে লেপিয়া দিলেন। মীনার অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু হইতে কয়েকটি তরল অনুতাপবিন্দু কোলের শিশুর পার্শ্ব-প্রদেশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে অনতিবিলম্বে খোকাকে বার বার চুম্বন করিয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবামাত্র, সুকুমারীর চক্ষু দুটি হঠাৎজ্বালা বিজলী-বর্ত্তিকার ন্যায় ভ্রূমধ্যে চড়িয়া বসিল। তিনি সন্ত্রাসিত অথচ কর্কশস্বরে বলিলেন, আ মরণ হতভাগিনী মেয়ে, এতদিন কথাটা চেপে রেখে দিয়েছিস ? কেন, অজিতের অত কি প্রয়োজন ছিল যে, তোকে এখানে এনে পৌঁছে দেয় !

মীনা অপরাধিনীর ন্যায় যুক্তি দেখাইয়া বলিল, সেখানে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছিল মা, তাই আমিই অজিতদাকে যেতে লিখেছিলাম।

সুকুমারী যেন কথাটাকে একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, কষ্ট হচ্ছিল, লেখাপড়া শিখে তোমার এই আক্কেল হয়েছে, ছাই হয়েছে ! কেন, স্বামীর ঘরে কষ্ট হলেও কি থাকতে নেই ? সেখানে পড়ে মরে যেতে পার্লিনি ? হতচ্ছাড়ী, তাই তো বলি, নিমু কি আমার, এমন একটা আঘাত পেলে যে তার শাশুড়ী যেমন তেমন, মাসিমাকে ও ভুলে যেতে পারে ? নিমু তো নিশ্চয়ই,—

না মা, তিনি কিছু মনে করবেন এমন ছোট তিনি নন। তোমরা

তাঁকে একটিবার খবর দাও, যে ভাবেই হোক, পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েও আমি তাঁকে মানিয়ে নেব।

বলিতে বলিতে মীনা খোকাকে বুকে চাপিয়া পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। সুকুমারী রোষবঙ্কিম দৃষ্টিতে মীনার পিঠের উপর মশালের মতন দুইচক্ষু ফুটাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা অবশ্য টেলিফোনের খবরের মতন উমেশবাবুর কাণে গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ ইহার গুরুত্ব বিসর্পিত হইতে না দিয়া, তিনি কয়েকদিন পরে সুকুমারীসহ নির্ম্মলের বাসার দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা মীনাকে একা রাখিয়া যখন বাহির হইলেন, তখনো আকাশের নীল অবলেপ মুছিয়া সন্ধ্যারাণীর ধূসর অঞ্চলে তলাইয়া যায় নাই। শরতের লঘু মেঘঢাকা আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের অভ্যুত্থান ক্রমেই ফুটফুটে হইয়া আসিতেছিল। বাতায়নপার্শ্বে ঝাউগাছের শীর্ষস্থলে বসিয়া, দুই একটা নীড়-ফেরা পাখী কলভাষণে সন্ধ্যারাত্রির মিলনারতি মন্দ্রিত করিতেছে। মীনা তাহার ঘুমন্ত শিশুকে দোলায় চড়াইয়া, অনতিদূরে জানালার দিকে যতদূর চক্ষু যায় চাহিয়াছিল। সমস্ত বাড়ীখানিতে ঠাকুর, প্যারীচরণ আর মীনা ছাড়া কেহ ছিল না। ঠাকুর রান্নাঘরে আবদ্ধ, প্যারীচরণ সিঁড়ির নীচে বসিয়া একখানি পুরাতন ছেঁড়া মহাভারত লইয়া উপুড় হইয়া ছিল। পথবিকম্পকারী লরী ও মোটরের চকিত হুঙ্কারে ক্ষণে ক্ষণে মীনার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তাহার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনস্রোতের বৈষম্যটাই তাহাকে ভূতগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এতকাল তাহার মানসিক শক্তি যে, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া, নবোদ্যমে অলক্ষিত মঞ্চে পদস্থাপনা করিত, আজ যেন আর তাহার চিত্তে সেই অন্ধ উন্মাদনার লেশমাত্র নাই—আজ যেন

তাহার প্রতি পাদবিক্ষেপের প্রাঙ্মুহূর্ত্তে ন্যায়-অন্যায়, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের অঙ্কগুলি এক দুই তিনের মতন পরপর সজ্জিতবেশে দেখা দেয়। আজ তাহার শিক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি, কঠোর সত্যের বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া তাহাকে নিক্তির কাঁটার ন্যায় খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। চিন্তার অনবসর মুহূর্ত্ত ক্রমে ঘড়িতে গিয়া একটা সীমায় পৌছিল—তাহার কানের কাছে সাতটা বাজিয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তে গৃহের পর্দ্দা উন্নয়নেব ছায়া দেখিয়া, সে ঘাড় বাঁকাইয়া আশ্চর্য্য ভীতকণ্ঠে বলিল, কে ?

অজিত মদবিচলিত পদক্ষেপে আসিয়া একটা কৌচে বসিয়া পড়িল। মীনার কণ্ঠতালু ক্রমেই রসহীন পাথর হইয়া আসিতেছিল। সে আতঙ্কে শিহরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিত্তদৌর্ব্বল্য চাপা দিয়া বলিল, একি, তুমি মদ খেয়ে এসেছ নাকি ! ছি ছি, তোমার এত অধঃপতন !

অজিতের রক্তজবার মতন দৃষ্টি মীনার দিকে ঢুলুঢুলু অথচ নিস্পন্দ। কথা বলিতে গিয়া তাহার স্বর কাঁপিয়া গেল। কিছুক্ষণ মৌন প্রতিকৃতির ন্যায় বসিয়া থাকিয়া, সে পুনরায় দাঁড়াইয়া বলিল, মীনা আজ তোমাকে আমার শেষ কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। পরশুদিন আমার বিয়ে হবার কথা আছে, শুধু তোমার কাছে একটা উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি।

তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ, তা তো সুখের বিষয়, তবে তুমি মদ খেয়ে এখানে কেন ?

মীনার চক্ষুতে কৌতূহলগত বিস্ময়ের বিভাস দেখিয়া, অজিত পুনরায় বসিয়া বলিল, তোমার কাছ থেকে একটা জবাব পাব বলেই আশা নিয়ে এসেছি। তুমি তো নিমুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছ, কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন ছিল মীনা, যৌবনের প্রথম প্রভাতে যার মুখ দেখে যাত্রা আরম্ভ

করেছিলাম সে আজ মুক্ত। বিবাহের বন্ধন অতি তুচ্ছ জিনিষ মীনা, তার পরেও একটা অকুণ্ঠ বন্ধন আছে যার কাছে অনুষ্ঠান তুচ্ছ, সমাজ তুচ্ছ, সংসারের ন্যায় অন্যায় তুচ্ছ—আমি সেই অমৃতলোকের তরফ থেকে বলছি মীনা, আজ শুধু আমার সাহসরূপিণী হয়ে এস, আমি বিয়ের স্বপ্ন তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিই। তোমার কোন ভয় নাই, আমার অগাধ অর্থ, অপরিসীম সম্পদ, আজ তোমার পায়ে অকাতরে লুটিয়ে দিচ্ছি মীনা, আমায় তুমি রক্ষা কর।

মীনার আপাদমস্তক ভূকম্পিত তরুর ন্যায় টলিয়া গেল। সে রূঢ় বিষাক্ত দৃষ্টি ফেলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি যে এত হীন হতে পার অজিতদা, তা আমি জানতাম না। আজ তুমি তোমার সত্য পরিচয় দিয়ে, তোমার প্রতি শ্রদ্ধার অবশিষ্টতম কণাটুকুও বিসর্জ্জন দেবার অবকাশ দিলে, ভালই করেছ অজিতদা, তোমার সংসার আজো স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, কিন্তু আজ আমার স্বামী আছেন, পুত্র আছে, শাশুড়ী আছেন—একটা বিরাট পবিত্র কর্ত্তব্য আমার মাথায় ঝুলছে!

অজিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার মুখের ফেনিল দুর্গন্ধ-বাষ্পে গৃহ অঞ্জনিত হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ পরে বলিল, তোমার এ পরাভব সাজে না মীনা, তুমি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী তার উপর সুন্দরী—

অবশেষ বলিবার পূর্ব্বেই মীনা তাহার উপর যবনিকা ফেলিয়া বলিল, পরাভব বটে অজিতদা, কিন্তু ইহা আমার স্বর্গীয় পরাভব, তুমি আমাকে আজো চিনতে পারোনি, তুমি যে আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, তাতে আমি নিজেকে লজ্জিত হবার যোগ্য মনে করছি!

অজিত যেন কশাঘাতস্পৃষ্ট অশ্বের ন্যায় ঝম্পপ্রদান করিল, সে

বিদ্রূপতিক্ত কণ্ঠে বলিল, এ কথাটা আগে মনে রাখলে কি আর শ্বশুর-বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলে মীনা ?

মীনা যেন মুখের উপর একটা আঘাত পাইয়া অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। বলিল, এর জন্যেই আজ তোমার সঙ্গে কথা বলিয়ে ভগবান আমাকে শাস্তি দিলেন। যাও, অজিতদা, বাইরের ঘরে গিয়ে বস, বাবা, মা এক্ষুণি আসবেন, বলিতে বলিতে সে প্যারীচরণকে ডাকিতে সুরু করিল।

অজিত যেন পলায়নতৎপর হরিণ ধরিবার জন্যে হাত বাড়াইয়া মীনার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ এইখানেই তোমার দম্ভ, তোমার অহঙ্কারের মাথা মুড়িয়ে যাব !

মীনার চীৎকারে প্যারীচরণ আসিয়া পড়াতে, অজিত পশ্চাতে হটিয়া বাহির হইবার সময় বলিয়া গেল, তা হলে সময়মত দেখা হবে মীনা, আমার বিয়েতে তুমিও যাবে কিন্তু।

মীনার সর্ব্বাঙ্গ তখনো যূপকাষ্ঠে অনুবদ্ধ ছাগশিশুর মতন কাঁপিতেছিল। কিন্তু প্যারীচরণের সম্মুখে তাহার এই অপমানের কাহিনীটা ধামাচাপা দিবার জন্যে বলিল, তোমরা যে সময়মত কোথায় যাও, একগ্লাশ জল চেয়ে হয়রান হয়ে গেলুম যে !

প্যারীচরণ নিমেষের মধ্যে জল গড়াইয়া দিয়া, যথাস্থানে গিয়া মহাভারতে মনোসংযোগ করিয়াছে। মীনা ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া শিশুর পার্শ্বে শুইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে টের পায় নাই। আহারের সময় তাহার মা আসিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দিলেন।

আহারে বসিয়া মা ও মেয়েতে আলাপ হইল। সুকুমারী বলিলেন,

নিমুকে অনেক করে রাজী করিয়েছি। কাল আবার আমি গিয়ে বেয়াইন ও নিমুকে নিয়ে আসব। তারা দু'চার দিন এখানেই থাকবেন।

মীনার আহত মনে ইহা উষ্ণ তাপের কাজ করিল। সে আস্তে আস্তে আহার শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। সুকুমারী যেন তাহাকে শোনাইবার জন্যেই বলিলেন, বেয়াইন আমার বেশ মিশুকে। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুব আলাপ জমিয়ে ফেললেন। জানিস্ মীনু, একসময় ছিল, যখন বেয়াইন কলকাতা সহরে লাখটাকার মুরুব্বি ছিলেন, কিন্তু সবই অদৃষ্টের ফের কিনা, বেয়াইয়ের ব্যবসা ফেল পড়ার সঙ্গে সমস্ত ছুনছান হয়ে গেল। তাই তো বলি, নিমু এত ভদ্র অথচ এই ভদ্রতা কি হঠাৎ হয়ে গেছল? ওরা বড়লোক ছিল রে, আমাদের চাইতেও বড়লোক ছিল।

মীনা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি গিলিয়া গেল। আজ তাহার কাছে নির্ম্মলের-ঐশ্বর্য্যবিত্তের পরিমাণই নির্ম্মলের প্রতি ভক্তির কারণ-স্বরূপ নয়, আজ তাহার হৃদয়-বাতায়নের রন্ধ্রপথে বিনয়নমিতা শ্রদ্ধার দিব্যজ্যোতির বন্যা আসিয়া তাহার অন্তর বাহির পরম পবিত্রতায় ভরিয়া দিয়াছে। আজ সে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য স্বামীর অনাবিল প্রেম-জাহ্নবীতে বিসর্জ্জন করাকেই শ্রেয় এবং প্রেয় জ্ঞান করিয়াছে,—এখানে যেন কোন চাকচিক্যের চাহিদা নাই, নিষ্কলঙ্ক, নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণযজ্ঞের পূজারিণী মীনা—আপনার ভক্তি-গৌরবে মহীয়সী!

রাত্রিশেষে মীনার দুয়ারে উষসীলিপ্ত অরুণের কোমল আগমনে তাহার জীবনের তরুলতা পুষ্পিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণে যেন পরিণয়ের রাত্রির শানাইয়ের করুণ সুর রণিয়া রণিয়া মঙ্গলগীতি গাহিয়া গেল। সুকুমারী যথাসময়ে গিয়া নির্ম্মলকে লইয়া আসিলেন। নির্ম্মল তাহার

পরিচিত মাসিমার বাড়ীতে পরম আকাঙ্ক্ষিত জামাতৃবেশে বাড়ীর সকলের কাছে অনুপম আদর-ভাগী হইয়া উঠিল।

আহারান্তে নির্ম্মল বিশ্রাম-লালসায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে মীনা খোকাকোলে লইয়া অতি সন্তর্পণে নির্ম্মলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল খোকাকে কোলে লইয়া চুমা খাইয়া বলিল, বেশ হয়েছে তো!

মীনার হৃদয়-তুষার নির্ম্মলের সোহাগপরশে গলিয়া মমতার নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিল। অবনতমুখী অশ্রুমতী মীনা নীরবে নির্ম্মলের পায়েব ধূলা লইবামাত্র নির্ম্মল তাহাকে টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, মীনু, আজ আবার বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ছে।

মীনা গদ্গদকণ্ঠে আপন বক্ষের আলোড়ন সমাহিত করিয়া বলিল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ বল!

নির্ম্মল তাহার বিস্রস্ত অলক নয়ন-পক্ষ্ম হইতে সরাইয়া বলিল, তোমার কোন অপরাধ নাই মীনু, মানুষের শিক্ষার অপব্যয়ের দরুণ যে শাস্তি, তাই আমি—বিশেষ করে তুমি ভোগ করেছ। আজ তোমার সেই ভুল ভেঙ্গেছে, ইহাই আমার পক্ষে, এই সংসারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মুক্তি।

মীনার নয়নের তলায় এতক্ষণ মুক্তাবলী আসর জমাইতেছিল, সেগুলি একসঙ্গে কপোলতল স্নিগ্ধ করিয়া বহিয়া গেল, সে মর্ম্মরধ্বনির ন্যায় শিহরমধুর কণ্ঠে বলিল, আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই, আজো কিছু বুঝি না, আমাকে চালাবার ভার নিলে বল?

বলিতে বলিতে মীনা উদ্গত অশ্রু নিবারণ করিতে না পারিয়া বালিশের তলায় মুখ গুঁজিয়া অজস্র ধারাবর্ষণ করিতে লাগিল। নির্ম্মল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইল। তাহাদের এই

পরিণাম-মধুর মিলনমাধুর্য্যে পৃথিবীর যুগযুগব্যাপী সত্য রহস্যের নিরাকরণ হইল দেখিয়াই বোধহয় দ্বিপ্রহরের আকাশ অধিকতর নীল হইয়া উঠিল, দিকচক্রবালের পরপার হইতে স্নিগ্ধ প্রশান্ত বায়ুহিল্লোলে তরুপল্লবের কচি পতাকা বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল, বাহিরের প্রকৃতি স্তব্ধ অচঞ্চল আবেশ লইয়া এই দুই মিলন-মহান নরনারীর প্রাণের সৌম্য জয়ন্তীর উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নির্ম্মল ডাকিল, মীনু,—

মীনা ঘনকৃষ্ণ সজল চক্ষু তুলিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

১৭

মরমে আঘাত পাইলে সকল মানুষেরই স্নেহের পিপাসা বাড়িয়া উঠে। অজিত মীনার কাছে নির্দ্দয় অপমান পাইয়া মঞ্জুলার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিল। সে মঞ্জুলার বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র সিঁড়ির মুখে মঞ্জুলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মঞ্জুলা তখন একটা সরু ধূতি পরিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, অজিতকে পথ ছাড়িয়া দিবামাত্র অজিত উপরে গিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মঞ্জুলা তাহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার নীচেকার কাজকর্ম্ম সারিয়া, যখন সে উপরে গেল তখন অজিত নেশাগ্রস্তের ন্যায় ঘুমে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। মঞ্জুলা পাখাটা খুলিল, মশারিটা খাটের চতুর্দ্দিকে গুঁজিয়া একটা মাদুর পাতিয়া সে নীচে শুইয়া পড়িল। সে জানিত যে, এ সময় অজিত কিছু খাইবে না—সুতরাং তাহাকে জাগায় নাই,—উপরন্তু আজ যেন মঞ্জুলা আর অজিতের জন্যে কণামাত্র স্নেহের অপব্যয় করিতে অনুদ্‌বুদ্ধ ছিল।

কিন্তু বিছানায় যত সহজে শুইতে পারিল, তত সহজে ঘুমের আরাধনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিল না। জানালার ফাঁক দিয়া এক ঝলক পাতলা চাঁদের হীরকটুকরা আসিয়া তাহার বালিশের উপরে পড়িয়া খেলা জুড়িয়াছিল। সে এই অমায়িক আলোক-শিশুর পানে তাকাইয়া রহিল। আজ সে বিমনাচিত্তে শুধু অজিতের কথায় তন্ময় ছিল। যেদিন সে মীনাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়াছিল, সেদিনও রাত্রে অজিত আসিয়াছিল। কিন্তু মীনাকে সরাইবার অপরাধে অজিত মঞ্জুলাকে যে সমস্ত অপমান বাক্যের

শতমুখী-দ্বারা প্রহার করিয়াছিল, আজো তাহার অন্তরের অন্তস্থলে ইহাদের দাগ বিদ্যমান, তথাপি সে অজিতকে ফিরাইতে পারিল না। সেও তো ইচ্ছা করিলে আজ অজিতকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেকে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিত, কিন্তু অন্তরের কোণে যেন একটা পাহ্নপাদপ তাহার সকল অনুতাপ, সকল অপমানের প্রতীকারেচ্ছাটাকে রসাভিষিক্ত করিয়া অজিতের জন্যেই আকুল করিয়া তুলিতেছিল। সহস্র দোষ করিলেও, অজিতকে ছাড়িবার কল্পনা যখনই তাহার মনে ক্ষণেকের দাগ কাটিয়াছে, তখনই পৃথিবীজোড়া অস্বস্তি আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আজো সে অজিতের কথাগুলি স্মরণ করিয়া অশ্রুপ্রবাহে উপাধান ভিজাইয়া তুলিল। মীনার পক্ষ লইয়া যখনই সে বলিয়াছিল যে,—অজিত, সংসারে যে জলে মানুষ তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেই জলই বন্যার বেশে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মীনার প্রাণ আছে, হৃদয় আছে কিন্তু তার সব স্নেহবৃত্তিগুলিই সীমাবদ্ধ ; এবং সীমার মধ্যে আছে বলেই তা এত মনোজ্ঞ, এত সুদর্শন মনে হয়। মীনার সৌভাগ্য দলিত করবার আগে একবার তার মনের পবিত্রতার কারণটিকে শ্রদ্ধা করতে শেখ।

অজিত কথাটাতে উত্তেজিত রুক্ষস্বরে বলিয়াছিল, মীনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তারই আকর্ষণে সে আমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করতে সাহস পেয়েছিল। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতা তার প্রাণে বিছিয়ে দিয়ে শুধু স্বার্থপরতাই দেখিয়েছ মঞ্জু, তোমার এতে গৌরবের বিষয় কিছুমাত্র নেই।

মঞ্জুলার আহত দৃষ্টি মেঝেতে পতিত হইল, সে করুণা-বিগলিত বচনে বলিল, অজিত, আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু একজন সতীর মর্য্যাদা রাখতে গিয়ে যে, আততায়ীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছি

তার জন্যে জগদীশ্বরের কাছে জবাবদিহির পথ খোলা আছে। আমাকে আজ তুমি স্বার্থপর বল আর যা'ই বল, একথাও তোমার জানা উচিত অজিত, গায়ের জোরে সংসার জয় করতে পারবে না, অর্থবলও তোমাকে মানুষের সমপর্য্যায়ে তুলবে না, ভালমন্দের মাপকাঠি প্রাণের ঔজ্জ্বল্য যে পর্য্যন্ত স্বীকার না করবে সে পর্য্যন্ত তোমাকে রাস্তার ভিখিরীর ন্যায় ফিরতে হবে।

অজিত এই কথাটাতে অপ্রত্যাশিতভাবে চটিয়া গেল, সে অসংযত স্বরে বলিল, সামান্য মিস্ট্রেস্ হয়ে এত নীতিকথা শোভা পায় কি মঞ্জুলা ?

বিদ্রূপটা যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় মঞ্জুলার প্রাণে গিয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হইল। সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, নীচে নামিয়া গিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই অজিত বাহির হইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, তোমার যদি সম্ভ্রমের ভয় থাকে তবে আমার জন্যে লোক পাঠিও না।

এমনি নিবিড় মর্ম্মদাহের মধ্য দিয়া সে রাত্রি মঞ্জুলার ঘুম হয় নাই। এবং তারপরে প্রায় দেড়বছর অজিত মায়ের সহযাত্রী হইয়া, তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে মিলনধারা শীতার্ত্ত শীর্ণা নদীর ন্যায় অবহেলার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ আবার সেই পুরাতন দুঃখের বোঝাটা যে, এমন অকস্মাৎ তাহার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় থাপে থাপে বসিয়া যাইবে, ইহার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু দুঃখের মুহূর্ত্তে, অতীতদিনের সুখের স্মৃতিলিপির অক্ষরগুলি মানুষকে বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করিবার সামর্থ্য আনিয়া দেয়। একে একে তাহার মাষ্টারীজীবনের একান্ত একাকীত্ব হইতে আরম্ভ

করিয়া অজিতের সঙ্গে পরিচয়, চিত্তে যৌবনের মর্ম্মরগীতি, অজিতের জন্যে প্রাণের নিভৃত কক্ষের সজ্জা ইত্যাদি স্মরণ করিতে করিতে মঞ্জুলার বিনিদ্র নয়ন অন্ধকারের মধ্যেও দিব্য দৃষ্টি পাইল। তাহার চতুর্দ্দিকে আলোর সহস্রধারা বহিয়া গেল, কি একপ্রকার আনন্দবেদনা তাহাকে স্বপ্নাদিষ্টের ন্যায় তুলিয়া দিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া, মশারিটা তুলিয়া অপলকনেত্রে অজিতের দিকে চাহিয়া সর্ব্বদুঃখ ভুলিয়া গেল। ইচ্ছা হইল, অজিতকে জাগাইয়া তুলে, তাহার চরণে প্রার্থনা করে, তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলে, ওগো, মানুষের অন্তর দিয়ে মানুষকে যাচাই করে আমাকে পায়ে স্থান দাও দেবতা।—কিন্তু এত বড় কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? পরক্ষণেই তাহার মনে হইল সে একটা সামান্য মিস্‌ট্রেস্‌ আর অজিত কৌলিন্য-গৌরবে মহৎ, ধনী, বুদ্ধিতে বিদ্যায় যশোসৌভাগ্যে অজিতের সম্মুখে স্বর্গের সোপান অনাবৃত পুষ্পাস্তীর্ণ; সে কেন ঐ সুন্দর যুবকের মহিম্নের আধার হৃদয়টাকে তুচ্ছ মায়ার আকর্ষণে বন্দী করিয়া রাখিবে? সে যে ভালবাসিয়াছে, সে অজিতকে প্রাণ নিবেদন করিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছে, তাহার জন্যে কি সে অজিতকে ধূলায় ম্লান হইতে দিতে পারে? মঞ্জুলা যেন দিব্য অনুভূতির স্পর্শ পাইয়া মশারি গুটাইয়া, মাদুরে আসিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে চক্ষু মেলিয়া চাহিবামাত্র অজিতের দুই চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। অদূরে সদ্যস্নাতা মঞ্জুলা, পরিধানে লালপেড়ে একটি গরদের শাড়ী, কমলাসনে বসিয়া আহ্নিক করিতেছে। তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে যেন মনে মনে একটু ভীত হইয়া উঠিল। এতদিনে বোধ হয়, সত্যি সত্যি মঞ্জুলা অজিতের প্রত্যেকটি ব্যবহারে অসঙ্গতির

ছোঁয়াচ পাইয়াছে। অজিতের এই সংশয় অমূলক নয়। সংশয় মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূরিতভাবেই উদয় হয। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কণামাত্র অবশিষ্ট থাকাপর্য্যন্ত আদর্শ তাহার কাছে কোন না কোন দাগ কাটিতে বাধ্য। নৈতিক পর্য্যায়ে অবনত চরিত্রের কাছে এই আদর্শের স্বল্প বিকাশও দেশলাইয়ের কাঠির কাজ করে, অল্পেতেই তাহার অনৃতের চিত্রগুলি ভয়ের পদতলে আত্মবিসর্জ্জন করে।

মঞ্জুলার আচার-নিষ্ঠার প্রতি একাগ্রতা দেখিয়া অজিত একটা শক্ত নাড়া খাইল। তাহার মগ্নচৈতন্য যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আজ পর্য্যন্ত তুমি যে ব্যবহার মঞ্জুলার উপর প্রয়োগ করিয়াছ তারই ফলে সে আজ জীবনের মধ্যপথে বৈষ্ণবী সাজিয়াছে।

অজিতের ধারণাটাকে দৃঢ়তর করিয়া মঞ্জুলা আসন ছাড়িয়া, তাহার জন্যে মুখপ্রক্ষালনের সরঞ্জাম হাজির করিয়া আনিল। বলিল, তুমি কি এখনি বাড়ী যাবে, না দ্বিপ্রহরে এখানেই ঠাকুরের ভোগ পেয়ে যাবে?

বলিতে বলিতে মঞ্জুলা অজিতকে প্রত্যুত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া নীচে নামিয়া গেল। অজিত মুখ ধুইয়া, ড্রেসিং টেবিলের উপরে রক্ষিত এক গ্লাশ মিশ্রীপানা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার ধারণা ছিল, মঞ্জুলা বোধ হয় তাহাকে নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে ভুলিবার পরিবর্ত্তে, তাহার অতি তুচ্ছ অভাব অভিযোগগুলি যে, সে এখনো মনে রাখিয়াছে তাহাতে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিল। সরবৎ পাণ করিয়া অজিত মাথায় বুরুশ চালাইয়া এইচ্ চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বিগত রাত্রে মীনার বাড়ীর কথা মনে পড়িবামাত্র তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে যে কত বড় অন্যায় করিবার জন্যে কাল মীনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, আজ যেন তাহা বাহিরের শান্ত সুস্পষ্ট

দিবালোকিত অট্টালিকার ন্যায় জাগরূক হইয়া উঠিল। মীনার প্রতি এই দুর্ব্যবহার বোধ হয় এতক্ষণে বাড়ীর সকলের কানেই গিয়াছে, বোধ হয় নির্ম্মলের কানেও গিয়াছে, আর একটা করুণার্দ্র সমবেদনার সুর তাহাদের বাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। অকস্মাৎ তাহার চেতনা অতীতদিনের ঘটনাবলীর সঙ্গত অসঙ্গত শ্রেণীগুলি তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। অনুশোচনার আঘাতে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া গেল। এই সময়ে তাহার পক্ষে একেলা বসিয়া থাকা সম্পূর্ণ ভীতিব্যঞ্জক। সে রেলিঙ্‌য়ে ঝুঁকিয়া ডাকিল, মঞ্জু!

যাই, বলিয়া মঞ্জুলা এক হাতে হালুয়া লুচি ও অন্য হাতে চা লইয়া উপরে আসিল। অজিতের বিশেষ ক্ষুধা ছিল না। কিন্তু অনুরোধে ঢেঁকি গিলিতে হইল। মঞ্জুলা আবার কি একটা কাজে নীচে যাইবার উপক্রম করিবামাত্র, অজিত তাহার আঁচলটা মুঠা করিয়া ধরিয়া বলিল, বস মঞ্জু, তোমাকে এখন যেতে দেবনা!

কিন্তু চক্ষু তুলিয়া মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া, তাহার হাতের মুঠা শিথিল হইয়া গেল। মঞ্জুলা নিরতিশয় ঘৃণায় ললাট কুঞ্চিত করিয়া, পরক্ষণেই তাহার বৈসাদৃশ্য ঢাকা দিয়া কহিল, তোমার বাসি কাপড়েই আমাকে ছুঁয়ে দিলে, দাঁড়াও আমি চান করে আসছি।

মঞ্জুলা পুনরায় নীচে গিয়া স্নানান্তে, একটি লালপাড় সাড়ী পরিয়া উপরে আসিয়া বলিল, তুমি এ বেলা এখানেই খেয়ে যাওনা!

অজিত যেন একটা কথা বলিতে গিয়া বাধা পাইল। সে স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ মঞ্জু, আজ তোমার ঠাকুরের প্রসাদ পেয়েই যাব। বাড়ীতে অবশ্য ভাববে—কাল আমার বিয়ে কিনা,—

কাল তোমার বিয়ে আর আজ তুমি যেখানে সেখানে ছুটোছুটি

করছ, এ তোমার ভারী অন্যায়। যাহোক, শীগগীর শীগগীর রান্না চড়িয়ে দিই গে, খেয়ে চলে যেও,—বলিয়া মঞ্জুলা গমনোদ্যতা হইল।

অজিত তাহাকে বসাইয়া বলিল, মঞ্জু তোমার এ তাড়ার প্রয়োজন নেই, আমি আজ বাড়ী যাব না। জীবনে যে সমস্ত অন্যায় করেছি তাই আমাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে, তার উপর আর ঈশ্বরকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বল কি, কাল তোমার বিয়ে যে! আচ্ছা সে দেখা যাবে, বলিয়া মঞ্জুলা ঝড়ের মতন গৃহত্যাগ করিয়া গেল।

রন্ধনান্তে মঞ্জুলা ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া, অজিতকে খাওয়াইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল। সে অজিতকে শুইতে নিষেধ করিয়া, কাপড় বদলাইয়া বলিল, চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসিগে।

মঞ্জুলার গলার স্বর যে স্বাভাবিক নহে, তাহা অজিত সহজেই টের পাইল। সে বিছানায় চাপিয়া বসিয়া কহিল, মঞ্জু, আমি তো একটা পশু নই—আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে। বিয়ে করে চিরদিনের জন্যে সংসারের কাছে দোষী হতে পারবনা।

মঞ্জুলার নয়ন ভরিয়া কাঁচা বিদ্যুতের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে ছলছল চক্ষু তুলিয়া বলিল, না না, তোমাকে আমি এমনভাবে কলঙ্কিত করতে পারবনা, তুমি বিয়ে কর, তাতে আমি পরম শান্তি পাব।

তোমার শান্তি হলেও আমার অশান্তির মালা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমি তোমাকে পথে বসিয়ে যেতে পারবনা, মঞ্জু!

কিন্তু অসম্পূর্ণ কথার মধ্যেই মঞ্জুলা অজিতকে আদেশ দিয়া কহিল, আমি যার মধ্যে সংসারের শ্রেষ্ঠ আনন্দের সন্ধান পেয়েছি তাকে মলিন হতে দেবনা, অজিত, আর এত বড় স্বার্থপর হলে দেবতার কাছে আমার জবাব দেবার কিছু থাকবে না।

অজিত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তুমি আমাকে জব্দ করতে চাও, না ?

মঞ্জুলা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অজিতের পায়ে প্রণাম জানাইয়া বলিল, আমার কল্যাণ যদি চাও তবে আমার কথা রাখো, এর বেশী কিছু বলতে পারবনা, এসো এখন তো বাড়ী যাই—ভগবানের ইচ্ছাই পূরণ হবে।

অজিত আর বাঙ্‌নিস্পত্তি করিলনা, মঞ্জুলার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় বাহির হইয়া গিয়া ট্যাক্সি চাপিল।

বাড়ীর সুমুখে অজিত নামিল, কিন্তু মঞ্জুলা গাড়ীতেই বসিয়া বলিল, এখন আমি তোমাদের বাড়ী যাবনা, কাল সন্ধ্যেয় আসব।

ড্রাইভারের সমক্ষে অজিত কথা বলিতে পারিলনা বটে, কিন্তু এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাইল যে, সেই চক্ষুর ভাষা ঈশারায় পাঠ করিয়া মঞ্জুলা পুনরায় বলিল, কাল নিশ্চয়ই আসব, কথা দিয়ে যাচ্ছি।

ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করিবামাত্র গাড়ী ফিরিয়া চলিল। মঞ্জুলা, যতক্ষণ দেখা গেল অজিতের প্রাসাদোপম অট্টালিকার চূড়ার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল। একটা সুতপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে চলিয়া আসিল। ইচ্ছা করিলেই যে, সে অজিতের ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী হইতে পারে, একথাটা যেন তাহার ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাতির মধ্যে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু শুধু অজিতের মুখ চাহিয়া, অজিতকে ভাবীকালের ইতিহাসের মধ্যে নিষ্কলুষ রাখিবার জন্যে, সে তাহার অন্তরের মহতী ইচ্ছাটাকে দমন করিতে যাইতেছে। তাহার জীবনের মধ্যে এমন কি ঔজ্জ্বল্য আছে যাহার স্নিগ্ধতায় সে অজিতকে চিরসুন্দর করিয়া রাখে ?

অজিক তাহাকে বিবাহ করিলে, তাহার পক্ষে হাতে আশমান আসিতে পারে, কিন্তু অজিতের মাতা ভগ্নি, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ আছে তো ? সেখানে অজিতকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করাই তাহার ধর্ম্ম।

এইপ্রকার আদর্শবাদ আসিয়া মঞ্জুলার হৃদয়ের উপর সমুদ্রের ফেণার ন্যায় আবরণ ফেলিল। কিন্তু রাত্রে বিছানায় পড়িয়া যেন তাহার ক্ষুধিত

আত্মা, অতৃপ্ত দেহ, নিদারুণ বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহার এতদিনের আশা, দিবারাত্রির কামনা, বিপদে সান্ত্বনার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ করিবার জন্যে কেবলমাত্র আগামী কল্য দিনটাই অবশিষ্ট আছে। তার পরদিবস, অজিতের উপর তাহার কোন দাবী দাওয়া থাকিবেনা, নবীন স্নেহের লালিত্যে অজিত অতীত স্বপ্ন ভুলিয়া যাইবে,—মঞ্জুলার জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখানুভব করিবে মাত্র। ইহাই মঞ্জুলার পক্ষে আরও মারাত্মক হইয়া উঠিবে। কিন্তু কেন এই নিষ্ঠুরতা? মঞ্জুলার হৃদয়ের মণিকোঠায় কি কোন সত্ত্বা নাই, যাহার জোরে সে সংসারকে জয় করিতে পারে? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর মিলেনা—কোনকালেই মিলে নাই। মঞ্জুলা শুধু কাঁদিল,—দুইচক্ষু রক্তরাঙা করিয়া কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিল, জগদীশ্বর, আমাকে কি এমন কোন মূলধন দাওনি যা' নিয়ে আমি অজিতের পায়ের তলায় একটু ঠাঁই করে নিতে পারি?

এমনিভাবে প্রতিধ্বনি-সম্বল প্রশ্নে তাহার অশ্রুসজল রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিবস হেমন্তের শিশিরসিক্ত প্রভাতে সে আপনার হৃদয় বাধিয়া লইল। সে তো অজিতের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেনা, তবে কেন সে অজিতের ব্যবধান-ব্যথায় কাতর হইবে? সে যাহা পাইয়াছে তাহা অক্ষয় এবং এই অমরাসুলভ রত্নের সংরক্ষণই তাহার কর্ত্তব্য।

সমস্ত দিনমান আনমনা উদাসিনীর মতন কাটাইয়া, সে একখানি লাল চেলী পরিধান করিল, আলতা-রসে পা দুটি রাঙাইল, সিঁথীর সিঁদুর-লেখা মস্ত মোটা করিয়া টানিল, তাহার অলঙ্কারগুলি যথাস্থানে পরিখচিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে, আপন অবয়বের প্রতিচ্ছবি আয়নাতে দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। পথে আসিয়া তাহার গোপন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিল। একডেলা আফিঙ ক্রয় করিয়া

সে তাহার ব্লাউজের মধ্যে হৃদয়স্থলে লুকাইয়া রাখিল—কিন্তু একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন তাহার মনের কথা কেহ জানিলনা।

সে যখন অজিতের বাড়ী প্রবেশ করিতেছিল তখন সবেমাত্র গ্যাসপোষ্টে আলো জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সদর-দরজায় কে ছিল তাহা মঞ্জুলা লক্ষ্য করে নাই। উপরে উঠিবামাত্র সুনন্দার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু সুনন্দার সঙ্গেও সে বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। সুনন্দা তাহার প্রতি ব্যস্তকণ্ঠে বলিলেন, এই যে মঞ্জু, এসেছ দেখছি, এস এস। তা ওঘরে অজিত আছে যাও দেখা করগে, তার পরে আমার ঘরে এসো—চাঁদের সঙ্গে দেখা হবে'খন। অজিত এখুনি বিয়ে করতে যাবে কিনা, তাই বড্ড তাড়াহুড়ার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠ্‌লুম—আচ্ছা আয় মা,—

বলিতে বলিতে সুনন্দা নীচের দিকে গেলেন। মঞ্জুলা তাঁহার কথায় হাঁ না কোন উত্তর না দিয়া অজিতের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। একঘর বন্ধুবান্ধব অজিতকে সাজাইতেছিল, কিন্তু মঞ্জুলা যেন সূর্য্যাস্তের শেষ তুলির একটি আঁচড়ের মতন অজিতের সুমুখে দাঁড়াইয়া, পরক্ষণেই প্রণাম করিয়া বলিল, তুমি তো এক্ষুণি বেরোবে, দেখি তোমার পায়ের ধূলো, বলিয়াই সে অজিতের পা দুটি ছুঁইয়া মাথায় ও বুকে স্পর্শ করিল। একবার শুধু অজিতের দিকে দৃষ্টিবর্ত্তিকা দিয়া অজিতের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল, তার পরেই নীরবে অভিমান-বিদ্ধ বুকের আকুল উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া অরুণাগমে বিদায়প্রার্থিনী তরুণী উষার ন্যায় অন্তর্হিত হইল।

গৃহের আবহাওয়াটা একনিমেষে ডায়নামোর আওয়াজের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অজিতের হাত হইতে বুরুশটা পড়িয়া গেল, সে বিস্ময়ে, বেদনায়, লজ্জায় রাঙা হইয়া ডাকিল, মঞ্জু!

কিন্তু মঞ্জুলা শুধু ঘাড় ফিরাইয়া, তাহার বিহ্বল দৃষ্টিতে আত্মার নালিশটাকে উজাড় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল মাত্র।

উত্তেজনায় শোকে তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল। পা দুটি যেন থাকিয়া থাকিয়া ফুটপাথের পাথরে আটকাইয়া যাইতেছিল। সুমুখে একটা গাড়ী দেখিয়া সে ইহার সাহায্যে বাড়ী পৌঁছিল। নীচেই তাহার রান্নাঘরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, তৈজসপত্রগুলি মড়ার মতন পড়িয়া আছে ; উপরে আসিয়া দেখিল, তাহার বিছানা খাট চৌকী আলো পাখা—সমস্তই যেন একেকটি মৃতদেহ। সে তৎক্ষণাৎ আফিঙয়ের ডেলাটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। বাহিরে খোলা ছাদের উপরে একটি বিছানা পাতিয়া শুইল, অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বদুঃখসন্তাপহারী নিদ্রা তাহাকে আলিঙ্গন করিল। উপরে অনন্ত নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ যেন তাহার চিরতিমির লোকের সাক্ষীস্বরূপ শাশ্বতকালের কোলে দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে মঞ্জুলার দেহ অবসন্ন হইয়া নির্জ্জন নিরালায়, স্বজনবান্ধবহীন বাড়ীখানিতে তাহার প্রাণের অক্ষম আশাটিকে সমাধিস্থ করিয়া অনন্ত শয্যা গ্রহণ করিল।

বাণীহীন মঞ্জুলার হৃদয়ের গোপন ভাষা বোধহয় প্রাতঃকালে অজিতের বাড়ীর শানাইয়ের সুরে রণিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু কেহ তাহার মর্ম্ম বুঝে নাই।

সমাপ্ত